ISSN-0971-8435

বিশেষ সংখ্যা

যোজনা

ধনধান্যে

জানুয়ারি ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹২০

শিক্ষা ঃ সাফল্যের চাবিকাঠী

ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় পট পরিবর্তন
আর গোবিন্দ

শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান
জনধ্যায়ালা বি জি তিলক

শিক্ষায় প্রযুক্তি : অস্থির প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা
রাজারাম এস শর্মা

মেয়েদের শিক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা
বিমলা রামচন্দ্রন

ফোকাস

নৈতিকতাভিত্তিক সমাজের দিকে
জে এস রাজপুত

বিশেষ নিবন্ধ
নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা ও বর্তমান ভারত
ড. জয়ন্ত চৌধুরী

বিশেষ নিবন্ধ
ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা
ড. অনুপ্রিয়া চাচা

‘জ্ঞান’—একটা সংযোগ প্রকল্পের সূচনা

ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে খ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করতে সম্প্রতি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ‘গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অফ অ্যাকাডেমিক নেটওয়ার্ক’ (সংক্ষেপে GIAN বা জ্ঞান) প্রকল্পের সূচনা করেছে। এই প্রকল্পে বিদেশের নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা আগামী বছর থেকে ভারতে এসে এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে যৌথভাবে নানা উদ্যোগ নেবেন এবং বিশেষ পাঠক্রমের শিক্ষকতা করবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬ জন, যুক্তরাজ্যের (গ্রেট ব্রিটেন) ৯ জন, জার্মানির ৬ জন, অস্ট্রেলিয়ার ৬ জন ও ইস্রায়েলের ২ জন সহ মোট ৩৮টি দেশের শিক্ষাবিদদের অংশীদারিত্ব ইতোমধ্যেই সুনিশ্চিত করা গেছে। এই তালিকায় রাশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, সুইডেন, সুইৎজারল্যান্ড, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াও রয়েছে। ৬৮ ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৩টা বিষয়ে ৩৫২টা পাঠক্রমে এই সব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষাদান করবেন।

বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই সব পাঠক্রমের মেয়াদ হবে ১ থেকে ৩ সপ্তাহ। সংশ্লিষ্ট আয়োজক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যেই এই প্রকল্পের আওতায় পঠনপাঠনের সুযোগ পাবে ও অন্যদের সামান্য মূল্য দিতে হবে। এছাড়াও বক্তৃতাগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার (লাইভ ওয়েবকাস্ট) করা হবে, যাতে দেশের সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চমানের শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে পারে। তারপরেও যাতে তারা এই পাঠক্রমের বক্তৃতাগুলো ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ ও সুযোগ পায়, সে জন্য এই সব পাঠ্যবস্তু সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট রাখা হবে।

পরবর্তীকালে এই সব বক্তৃতা সারা দেশের সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে স্বয়ং (SWAYAM), বৃহৎ মুক্ত অনলাইন পাঠক্রম (MOOC) ও জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি)-এর মাধ্যমে। এই সব পাঠক্রমে ভর্তি হতে নাম নিবন্ধিকৃত করার জন্য আইআইটি খড়গপুর একটা ওয়েব পোর্টাল (gian.iitkgp.ac.in) চালু করেছে।

প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য যৌথ উদ্যোগের সূচনা

প্রযুক্তির দশটা বিশেষ ক্ষেত্র যেগুলো ভারতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, সেই সব ক্ষেত্রের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য গবেষণার রূপরেখা তৈরি করতে সম্প্রতি ‘ইম্প্রিন্ট ইন্ডিয়া’ নামক উদ্যোগের সূচনা হল। সব ক’টা আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ও আইআইএসসি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স) যৌথভাবে এই উদ্যোগের সূচনা করল।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য : ১। সমাজ কল্যাণের জন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে উদ্ভাবনের প্রয়োজন, সেগুলোকে চিহ্নিত করা, ২। চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলোতে সরাসরি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ৩। এ সব ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য অর্থ সুনিশ্চিত করা, এবং ৪। গ্রাম/শহরাঞ্চলের জীবনযাপনের মানের ওপর এই গবেষণার প্রভাবের প্রেক্ষিতে এই প্রচেষ্টার ফলাফল পরিমাপ করা।

এই উদ্যোগের আওতাধীন দশটা বিশেষ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকছে একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান (আইআইটি/আইআইএসসি), যথা :

ক। স্বাস্থ্য—আইআইটি খড়গপুর

খ। কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)—আইআইটি খড়গপুর

গ। উন্নত উপকরণ—আইআইটি কানপুর

ঘ। জল সম্পদ ও নদী—আইআইটি কানপুর

ঙ। সুস্থিত শহুরে নকশা—আইআইটি রুরকি

চ। প্রতিরক্ষা—আইআইটি মাদ্রাস

ছ। উৎপাদন শিল্প—আইআইটি মাদ্রাস

জ। ন্যানো-প্রযুক্তি—আইআইটি বম্বে

ঝ। পরিবেশ বিজ্ঞান ও জলবায়ু পরিবর্তন—আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর

ঞ। শক্তি নিরাপত্তা—আইআইটি বম্বে

ইনজেকশনের মাধ্যমে পোলিও টিকা দেওয়ার অভিযান শুরু

বিশ্ব থেকে পোলিও চিরকালের মতো দূরীকরণের লক্ষ্যে (গ্লোবাল পোলিও এন্ডগেম স্ট্র্যাটেজি) ভারত তার অঙ্গীকার রক্ষায় ইনজেকশনের মাধ্যমে পোলিও টিকা দেওয়ার জন্য ইনঅ্যাকটিভেটেড পোলিও ভ্যাক্সিন (IPV) অভিযান শুরু করেছে।

দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য দ্বিগুণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং চিরতরে পোলিও দূরীকরণের উদ্দেশ্যপূরণে ভারত সরকার ওরাল পোলিও ভ্যাক্সিন (OPV) কর্মসূচির পাশাপাশি এই অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আসাম, গুজরাট, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ—এই ছ’টা রাজ্যে অভিযান চালানো হবে। এক বছরের কমবয়সি শিশুদের ওরাল পোলিও ভ্যাক্সিনের তৃতীয় ডোজের সঙ্গে ইনজেকশনের মাধ্যমে এই টিকাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

২০১৫ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সভা (ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অ্যাসেম্বলি)-র সুপারিশ অনুযায়ী ‘গ্লোবাল পোলিও এন্ডগেম স্ট্র্যাটেজি’—অনুমোদিত পোলিও টিকাকরণের এই নতুন পদ্ধতির সূচনা করা হল।

জানুয়ারি, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় পট পরিবর্তন — আর গোবিন্দ ৫
- শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান — জনধ্যায়ালা বি জি তিলক ১০
- শিক্ষায় প্রযুক্তি : অস্থির প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা — রাজারাম এস শর্মা ১২
- মেয়েদের শিক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা — বিমলা রামচন্দ্রন ১৪
- উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ — ড. হিমাংশু ঘোষ ২০
- শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টি — মিতালি পালধি ২৪
- প্রথম ভাষা চর্চা : কিছু ভাবনা ও কিছু সংশয় — ঋত্বিক মল্লিক ৩১
- গ্রামীণ কিশোরীদের মধ্যে নেতৃত্বের জন্য দক্ষতা বিকাশের প্রেরণা — ড. পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি ৩৬
- সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা — অধ্যাপক অবতার সিং ৩৯
- মেক ইন ইন্ডিয়া মিশনে শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের যোগসূত্র — অশোক ঝুনঝুনওয়ালা ৪২
- প্রান্তিক তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা : ইস্যু, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতির উপায় — এস শ্রীনিবাস রাও ৪৬
- জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার : একটি জাতীয় সম্পদ গঠন — খড়্গপুর আইআইটি-র গবেষকরা ৪৮
- উচ্চ মানের শিক্ষার লক্ষ্যে — কিরণ ভাট্টি ৫২

বিশেষ নিবন্ধ

- ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা — ড. অনুপ্রিয়া চাচা ৫৪
- নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা ও বর্তমান ভারত — ড. জয়ন্ত চৌধুরী ৫৮

ফোকাস

- নৈতিকতাভিত্তিক সমাজের দিকে — জে এস রাজপুত ৬৭

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৭০

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা

'পরিবর্তনের সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার হল শিক্ষা'—নেলসন ম্যান্ডেলার এই বিখ্যাত উক্তি খুব সংক্ষেপে শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে। এই কথা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একটা তরুণ গণতন্ত্র হিসেবে ভারত শিক্ষাক্ষেত্রে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শিতার কল্যাণে শিক্ষাক্ষেত্রের বিকাশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর আজ আমরা এর সুফল পাচ্ছি। ঐতিহাসিকভাবেও ভারতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণরা পড়াশোনা করত জ্ঞান অর্জন করার জন্য আর, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ বা শাসনব্যবস্থা ও বৈশ্যরা ব্যবসা পরিচালন করার মতো বিশেষ কার্যপদ্ধতি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করত। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল জীবিকাকেন্দ্রিক। সে যুগে আন্তর্জাতিক স্তরেও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ ছিল। ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নালন্দা—এখানে সব ধারার বিষয় নিয়ে চর্চা করা হত এবং এক সময়ে একসঙ্গে প্রায় দশ হাজার বিদ্যার্থী নালন্দায় পাঠরত ছিল।

স্বাধীনতার পর, আইন প্রণেতারা সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ-সৃষ্ট অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে সর্বজনীন একটা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়ন করে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং একটা জাতীয় শিক্ষা নীতিও ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে সর্ব শিক্ষা অভিযান ও মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের (মিড ডে মিল স্কিম) মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে নীতি প্রণেতারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করে তোলার প্রচেষ্টা করেন।

আজ আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারত শুধুমাত্র একটা দ্রুত উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবেই গৌরবের স্থান অধিকার করে নেই, এর পাশাপাশি ভারত যোগ্য ও শিক্ষিত মানবসম্পদের ভাণ্ডারেরও অধিকারী। উচ্চশিক্ষিত, প্রযুক্তি-নিপুণ (টেক-স্যাভি) ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষিত ভারতীয় নাগরিকরা সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে নানারকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তা ভারতের জন্য গর্বের বিষয়। এই সময়কালে অর্জিত কৃতিত্বের মধ্যে একটা লক্ষণীয় সাফল্য হল সাক্ষরতার হারে বৃদ্ধি। স্বাধীনতার সময় ভারতের সাক্ষরতার হার মাত্র ১২ শতাংশ ছিল। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, আমাদের সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ৭৪.৪ শতাংশ। কেরালায় ৯৩.৯১ শতাংশ ও মিজোরামে ৯১.৫৮ শতাংশ সাক্ষরতার সর্বোচ্চ হার অন্যান্য রাজ্যকে অনুপ্রেরণা দেয়।

যোজনা

এই পথ মোটেই বাধাহীন ও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। শিক্ষা অর্জনের সুযোগ আজও অনেকের কাছে এক অধরা স্বপ্ন, বিশেষত দুর্গম বা গ্রামীণ অঞ্চলে, যেখানে কোনও স্কুল নেই অথবা বৃষ্টি বা তুষারপাতের কারণে স্কুলে পৌঁছানো অসম্ভব। রাষ্ট্র-নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তপশিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য প্রান্তিকগোষ্ঠীর মানুষদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এদের জন্য শিক্ষার সুযোগে সাম্য আনা নীতি প্রণেতাদের কাছে এক চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে বাড়ি থেকে স্কুলের বিশাল দূরত্ব বা দুর্গম অবস্থান ও স্কুলে আলাদা শৌচাগারের অভাবের ফলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় বেড়ে যায় আর, সেই জন্যই স্কুলছুট মেয়েদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় পরিকল্পনা করার সময় ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয়নি। এখন এসব বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকার সমাজের সার্বিক বিকাশের জন্য নানান গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে, বিশেষত এই সব শ্রেণির মানুষদের শিক্ষাগত প্রগতির জন্য। জ্ঞান (GIAN), স্বয়ং (SWAYAM) ও জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি)-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার আরও প্রসার করা হচ্ছে। অন্তর্নিহিত নজরদারী ও কার্যকরী মূল্যায়ন ব্যবস্থা আর স্কুল-কলেজে উচ্চ শিক্ষার বৃত্তীয়করণ (ভোকেশনালাইজেশন) যে এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, তা উপলব্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ভালো ফল করার চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটেছে। এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর প্রচুর চাপ বাড়ার কারণে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শিশু যেন শুধু এক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদিত পণ্য মাত্র, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ আবির্ভূত ব্যক্তিবিশেষের নিজে থেকে চিন্তা করার, নিজের অধিকার দাবি করার বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। স্কুলের পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ যুক্ত করতে হবে, যাতে এই সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকে সমাজের সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করতে পারে। ক্রমাগত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন (কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশান) ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ১০-১৮ বছরের পড়ুয়াদের জন্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সূচনা করে। সর্ব শিক্ষা অভিযানে উচ্চ প্রাথমিকের ছাত্রীদের উচ্চ-মানের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সুনিশ্চিত করে তাকে আদর্শ নাগরিক বানাতে গেলে স্কুল-কলেজে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

আমরা ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছি। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্র-নির্মাণ ও ভাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা। সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে এই দেশে এমন সব আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব হবে যারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হবে।❑

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার পট পরিবর্তন

অগ্রাধিকারসমূহ

ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে বদলে সকলের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছে ছয় দশক আগেই। তবুও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে অনেক। এখনও শিক্ষাব্যবস্থায় রয়ে গেছে বহু বৈষম্য। বিদ্যালয়ছুটদের হারটাও রীতিমতো উদ্বেগজনক। মেয়েরা এখনও বহু দিক থেকেই বঞ্চিত। বিজ্ঞানশিক্ষার দিকটি অবহেলিত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কাজ করছেন যন্ত্রের মতো। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। শিক্ষার অধিকার আইনে দেখানো পথে চললে কি অবস্থার পরিবর্তন হবে? নাকি এরও পরে প্রয়োজন একটি জাতীয় শিক্ষা নীতির? বিশ্লেষণ করেছেন **আর গোবিন্দ।**

ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থাটা ছিল শুধু সমাজের ওপরতলার কিছু মানুষের জন্য। এই শিক্ষাব্যবস্থা খোল-নলচে বদলে সকলের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে ছয় দশকেরও আগে। কাজটা সহজ ছিল না মোটেও। শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা এবং সকলের জন্য উন্নত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার পথে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সাফল্য মিলেছে। তাৎপর্যপূণ নীতিগত কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের প্রায় সর্বজনীন নথিভুক্তি লক্ষ করা গেছে। ছয় দশকের এই যাত্রাপথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দান। তারপরেই ২০০৯ সালে ভারতীয় সংসদে প্রণীত হয় শিক্ষার অধিকার আইন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা এবং উচ্চ শিক্ষায় সকলের জন্য সমান অধিকার সুনিশ্চিত করার বিশাল দায়িত্বও সম্পন্ন করেছে দেশ। এই সমস্ত নীতিগত পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্য নতুন আশা জাগিয়েছে।

বুনিয়াদি স্তরে শিশুদের প্রায় সর্বজনীন নথিভুক্তি নিশ্চিত করা গেছে এবং সেই সঙ্গে সর্বস্তরের শিক্ষায় সুযোগের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো গেছে। এবার শিক্ষার গুণমান নিশ্চিত করার দিকে এগোতে চায় দেশ। শিশুদের শুধু বিদ্যালয় পাঠিয়েই দেশের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না তারা যাতে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা পায় তাও দেখতে হবে। এজন্য কিছু নীতিগত সংস্কার চাই। বিশেষ কিছু অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগের পাশাপাশি, সহায়সম্পদের বিনিয়োগও প্রয়োজন। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে সমতার দিকটি বজায় রেখেই কিন্তু এই গুনমান বৃদ্ধির কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। সকলের জন্য উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় অবিলম্বে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন তার কয়েকটির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব আমার এই নিবন্ধে।

সংহতি সাধনের উদ্যোগ

সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার— উভয় পক্ষই জোগানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে চলেছে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তো এই কথাটি একেবারে খাঁটি। বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের সম্পূর্ণ নথিভুক্তি নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু এর ফলে যে পরিমাণ সহায়সম্পদের জোগান রয়েছে তার বিতরণে অহেতুক অসাম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এর পরিণামে শিক্ষাব্যবস্থাতেও দেখা দিচ্ছে একটা বৈষম্য। এছাড়াও ওপর থেকে নীচের তলায় জোগানোর যে তত্ত্ব তার ফলেও অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত কেন্দ্রগুলি একেবারে অব্যবহৃত রয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নথিভুক্তির নিরিখে ছোটছোট যে বিদ্যালয়গুলি আর্থিক বা শিক্ষাগত দিক থেকে গ্রন্থাগার কিংবা পরীক্ষাগারের মতো গুণমানসম্পন্ন পরিকাঠামো ও শিক্ষার সুযোগ দিতে অপারগ সেগুলির কথা সাম্প্রতিককালে বার বার উঠে আসছে। বাস্তব চিত্রটা বলে, দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা একশোরও কম। এর মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ই আছে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ এমনকী ২৫-এরও কম। এ হেন পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে একত্রীকরণ বা সংহতি সাধনের এক প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ দেশের বিভিন্ন অংশে জনবিন্যাস দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জন্ম-হার কমছে। শিশুদের এক সঙ্গে দল বেঁধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার ধারাও আর নেই। আগামী বছরগুলিতে এই প্রবণতা বাড়বে

বই কমবে না। তখন কিন্তু পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়বে।

একত্রীকরণ বা সংহতি সাধনের এই ধরনের নতুন নীতিতে এমন এক কাঠামো গড়ে তোলা হবে যার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলিকে কার্যকরভাবে চালানো ও উন্নত মানের শিক্ষার স্বার্থে চালু বিদ্যালয়গুলিকে একত্রে যুক্ত করা যাবে। এছাড়া যাতায়াত বা থাকার বন্দোবস্ত করে শিশুদের বিদ্যালয়ে যোগদান বাড়ানোর নানান বিকল্প পন্থাগুলিকেও খতিয়ে দেখা যেতে পারে এই ব্যবস্থায়। যেসব গ্রামের এক প্রান্তে ছোট ছোট বিদ্যালয় দেখা যায় সেই সমস্ত গ্রামে অবধারিতভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস। ফলে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় অসাম্য। তাই স্থানীয় মাপকাঠি যেমন, বিদ্যালয়ের আয়তন ও অবস্থান, সেই বিদ্যালয়ে আশপাশের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির নিরিখে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জাম ও মানবসম্পদ নির্দিষ্ট করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় কি শিক্ষার প্রথম সোপান হওয়া উচিত?

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, যে বয়সে শিশুরা বিদ্যালয়ে যায় সে বয়সের মধ্যেই তাদের মধ্যে কিছু দক্ষতার বিকাশ ঘটে গেলেও সেগুলি কারও নজরে পড়ে না। নিউরোসায়েন্স বা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমীক্ষা শিশু বয়স থেকেই বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সপক্ষেই রায় দেয়। বিশেষ করে শৈশবকাল থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং তাদের চিন্তার শক্তির বিকাশ ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা অর্জনের পক্ষে যে সহায়ক হয়ে ওঠে সেকথা প্রমাণিত হয়েছে। অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি। তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে দেরিতে। বিদ্যালয়েও তারা ভালো ফল করতে পারে না এবং তাদের মধ্যেই বিদ্যালয়ছুট হওয়ার প্রবণতাও বেশি। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু একটি শিশুর শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একটা বিষয়ে শিক্ষাবিদরা কিন্তু একমত যে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার সুফল কিন্তু প্রাথমিক স্তরেও পৌঁছে যায়। শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে যে লেখাপড়া আয়ত্ত করার দক্ষতার অভাব রয়ে যায় সেটাই শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের সামনে সবচেয়ে বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় সকলের সঙ্গে মিশতে শেখা বা নিজেকে বশে রাখার মতো যে গুণগুলো শিশুদের মধ্যে তৈরি হবে তা পরবর্তীকালে শ্রেণিকক্ষের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের অনেক কাজে দেবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধানের কর্মসূচিগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বালিকারা যাতে ছোট ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই প্রাক্-বিদ্যালয় পাঠক্রমের সূচনা করা হয়েছে। ভারতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের এক ছাতার তলায় একদিকে ছয় বছর পর্যন্ত বয়সি শিশুদের বিকাশে সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের আগে ও পরে পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত ব্যবস্থার অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর এবং সহায়সম্পদের জোগানও পর্যাপ্ত নয়। তাই বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়নও আবশ্যক।

শিশু শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা

এ দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের প্রজন্মের পর পর প্রজন্ম শুধু দেনার দায়ে বেগার খেটে নষ্ট হয়ে হয়ে যায়। শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ তারা পায় না। পুরুষাণুক্রমে ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাদের জীবনটাই হয়ে ওঠে দুঃখ-যন্ত্রণার বারমাস্যা। এইরকম প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের সুকুমার অনুভূতিগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। দু পয়সা রোজগারের জন্য শিশুদেরও তারা কাজে লাগিয়ে দেয়। এর ফলে ওই শিশুদের লেখাপড়া আর এগোয় না। তা সত্ত্বেও শিক্ষাকেই তারা মনে করে নিজেদের দুঃখকষ্ট লাঘবের একমাত্র পথ। খুব অত্যাচারী বা উদাসীন বাবা-মা ছাড়া হতদরিদ্র পরিবারগুলির বাবা-মায়েরা নেহাত নিরুপায় না হলে বাচ্চাদের কাজে পাঠান না। তাই সবার আগে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার বড় বড় কথা বলে আখেরে কাজের কাজ কিছু হবে না। শিশুরা যাতে কাজ ছেড়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য এক কার্যকর বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে উপযুক্ত নীতি থাকা আবশ্যক।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থান

শিক্ষক-শিক্ষিকারাই শিক্ষার গুনমান নিশ্চিত করে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে উপযুক্ত নীতিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে যেগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন। সম্প্রতি যে 'টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট' চালু হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক বহু প্রার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত বা পেশাগত ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও তারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না। যারা শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে বেছে নিতে চাইছেন তাদের ফলাফলও যে আশানুরূপ হচ্ছে না এই পরীক্ষাই তার প্রমাণ। চাকরিতে প্রবেশের আগে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অবস্থার খানিকটা বদল হয়তো ঘটানো যায়, তবে পরিস্থিতিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে ধারাবাহিকভাবে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত প্রয়োজনগুলি পূরণ করার দিকে নজর দিতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযান বা RMSA-এর আওতায় মাঝে মধ্যে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের

আয়োজন করলেই চলবে না, বরং বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সম্পূর্ণরূপে একজন পেশাদার হিসাবে গড়ে তুলতে যথোপযুক্ত একটি নীতি রচনা করতে হবে। এই ধরনের নীতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল বিষয়ের আধুনিকীকরণ তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও স্থান দিতে হবে। নিজেদের উন্নতি তথা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সারা জীবন ধরে শেখার সুযোগ করে দেওয়াই হবে এই নীতির লক্ষ্য। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে বা চাকরির সুযোগ রয়েছে এমন সব পেশাগত কর্মসূচিতে (প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কোর্স) অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার কথাও থাকবে এই নীতিতে। অর্থাৎ এই নীতির মূল কথাই হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে এক সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি তথা পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তোলা ও প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে ভাবতে শেখানোর জন্য বিদ্যালয় বেছে বেছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগের নীতি গ্রহণ করা উচিত। কোনও বিশেষ বিদ্যালয়ের বদলে গতানুগতিকভাবে শিক্ষক নিয়োগের ঔপনিবেশিক ধারাকে এবার প্রশ্ন করার সময় এসেছে। বিষয়টিকে নিয়ে বহুবার বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু শিক্ষকদের নিয়োগ ও বদলির ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ এতটাই শক্তিশালী এবং এর মধ্যে রাজনীতির এত সমীকরণ জড়িত যে কোনও রাজ্য সরকারই এ বিষয়ে মুখ খুলতে চায় না। একেই শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে কেন্দ্রের এই প্রবল আধিপত্য তার ওপর বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে শিক্ষা দপ্তরের কর্তা, স্থানীয় জনসমাজ এমনকী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের কাছেও তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রেফ এক রূপায়ণকারীর—যিনি এক বৃহত্তর ব্যবস্থার জন্য আগে থেকেই গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণ ঘটিয়ে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ প্রণালীর যদি আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয় তাহলে বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থাতেও মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু কীভাবে এই পরিবর্তন আনা যাবে সেটাই এক বড় প্রশ্ন। কারণ এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দক্ষতার পাশাপাশি মানসিকতার পরিবর্তনও বড় জরুরি। এজন্য চিরাচরিত শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মরত প্রধান শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে আর যাই হোক, অবিলম্বে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

শিক্ষায় নারী-পুরুষের বৈষম্য নিয়ে নতুন করে ভাবনা

অনেকের মতে এ দেশে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার মূল সমস্যাটা এসেছে কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশের সমস্ত রাজ্যেই বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির বিচারে লিঙ্গবৈষম্য হয়তো কমেছে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমরা কি যথেষ্ট এগোতে পেরেছি? মেয়েদের শিক্ষার পথে এখনও বেশ কিছু বাধা রয়ে গেছে। বাড়িতে ছোটছোট ভাই-বোনেদের দেখাশোনার দায়িত্ব মেয়েদের ঘাড়েই চাপে। ফলে শৈশবে যে শিক্ষা তাদের শুরু হওয়া দরকার ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিতই রয়ে যায়। তার ওপর, প্রায়শই গ্রামের বাইরে বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি মেয়েদের মেলে না। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মিডল স্কুল) খোলার ক্ষেত্রে দূরত্বের যে বিধি রয়েছে তা মেয়েদেরই স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রতি যে প্রয়াস চলেছিল তাতে দেখা গেছে যে বিদ্যালয়গুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো ও শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে অবস্থার অনেক হেরফের হয়। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মেয়েদের নাম বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হল না, কিংবা বুনিয়াদি স্তরের পড়া সম্পূর্ণ না করেই তারা বিদ্যালয় ছেড়ে দিল, বা মাঝপথেই বাবা-মা জোর করে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে আনল, অথবা, তারা উচ্চ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গেল না—পরিসংখ্যানের বিচারে এগুলো স্রেফ এক একটা ঘটনা। এদের বলা হবে বিদ্যালয়ছুট, বলা হবে অনথিভুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতার বাইরে থেকে যাওয়াটা কোনও নীরস পরিসংখ্যান বা ঘটনা নয়। এটা কোনও মুহূর্তের সিদ্ধান্তও নয়। মেয়েটি বা তার পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের বহু জটিল বিষয় জড়িয়ে থাকে এর মধ্যে। এমনি-এমনি কোনও মেয়ে বিদ্যালয়ছুট হয় না। তার নেপথ্যে থাকে বহু কারণ। কোনও কারণ নিহিত থাকে তার পরিবারে, কোনওটি তার আশপাশের জনসমাজে ও পরিচিতদের মধ্যে, আবার কোনটি থাকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ভেতরেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে কোনও মেয়ে কেন বাদ পড়ছে সেটা বুঝতে গেলে তার ব্যক্তিগত জীবনের ওঠা-পড়াগুলোকে ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। তবে সেজন্য মেয়েটি, বা তার বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলাদা করে ডেকে কিছু প্রশ্ন করলেই হবে না। মেয়েরা যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে ওঠে বা বিদ্যালয় ছেড়ে যায় তখন অনেকের মধ্যে থেকে এক-এক জনকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বিদ্যালয় ছাড়ার অন্তর্নিহিত কারণগুলি পর্যালোচনা এবং বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বাদ যাওয়ার জটিল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠবে। এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতির সঙ্গে বাড়িতে, জনসমাজে তথা বিদ্যালয়ে শিশুকন্যাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি সমাধানের বিভিন্ন পন্থাকেও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করতে হবে। শিশুকন্যাদের জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়জুড়ে তাদের সহায়তা দিয়ে যেতে হবে এবং যেসমস্ত ঘটনা তাদের জীবনে শুধু সমস্যা ডেকে আনে সেগুলির মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিককালের ‘বেটি

বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচিও রয়েছে। কিন্তু শুধু এগুলিই যথেষ্ট নয়, মেয়েদের শিক্ষার জন্য অবিলম্বে এমন একটি সর্বাত্মক নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পরও বজায় থাকবে এবং শুধু সুযোগের সমতা তৈরি নয়, বরং লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠাই হবে সেই নীতির লক্ষ্য। তাছাড়া সমাজে ছাপ ফেলার মতো দৃষ্টিভঙ্গি যাতে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করাও হবে এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। যে সমস্ত যুবক-যুবতী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে এবং যাদের হাতে ভাবীকালের সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের শিক্ষার দিকটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এই নীতিতে।

বিদ্যালয় শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিদ্যালয় শিক্ষার গুণমান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। তবে, একটা কথাই বলা যায় যে ছোট ছোট পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আরও মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতির উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়গুলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার মানেই যে বিদ্যালয়গুলিকে হার্ডওয়্যার ও মালিকানা স্বত্ব-সহ সফ্‌টওয়্যার সরবরাহ করতে হবে বা বিদ্যালয়ের সব কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে বলে যে ধারণা বর্তমানে চালু রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একটা কথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে আজকালকার দিনে সব বাড়ন্ত বাচ্চাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে পরিচিত; এটা তাদের জীবনের অঙ্গ। বিদ্যালয়ে সুসংহতভাবে এর ব্যবহার না হলে বাচ্চারা বিদ্যালয় থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নবোধ করবে। ইউনেস্কোর 'আমাদের সৃজনশীল বৈচিত্র্য' (আওয়ার ক্রিয়েটিভ ডাইভার্সিটি) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রযুক্তির পরিসর থেকে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে তারা আগামী দিনের 'তথ্যভিত্তিক সমাজে' খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। এর ফলে সমাজের মধ্যে আবার একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে। একদিকে থাকবে উন্নত প্রযুক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত সমাজের ওপরতলায় কিছু মানুষ। আর অন্যদিকে, এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত সমাজের লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনতা। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে যুব সম্প্রদায়ের ওপর। সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা সারা দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য করবে। বঞ্চিতরা 'তথ্যভিত্তিক সমাজে'-র বাইরে গ্রামে-গঞ্জেই পড়ে থাকবে।

শেখার ওপর মূল গুরুত্ব

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই কিন্তু শেখা। ছেলে-মেয়েরা লিখতে-পড়তে শিখবে, জ্ঞানার্জন করবে—এই আশাতেই বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠান। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের গাফিলতি কিন্তু কোনওমতেই বরদাস্ত করা যায় না। বাচ্চাদের শিক্ষায় ঘাটতি থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশি। তবে বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের শতকরা হার বা জাতীয় স্তরের পরীক্ষার বিচারে জাতীয় লিগে স্থান অর্জনের নিরিখে বিদ্যালয়ের প্রকৃত মান নির্ণয় করা যায় না। বৈষম্য বা শিশুদের বিদ্যালয়ছুট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাকে অতিক্রম করে গুণমানের সঙ্গে যদি সমতার মেলবন্ধন ঘটাতে হয় তাহলে অবশ্যই নম্বর বা গ্রেড দিয়ে বিদ্যালয়ের গুণমান বিচার করা যাবে না। কারণ তাতে বৈষম্যগুলিকে চাপা দেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হবে। মূলত যে দুটি কারণে গুণমানের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয় সেগুলিকে চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ দুটি হল—প্রথমত, গুণমানসম্পন্ন বিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের ভেতরেই বৈষম্যমূলক আচরণ ও ভেদাভেদ।

তাছাড়া অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ বিদ্যালয়গুলির মান কিছুটা উন্নত করতে পারে মাত্র। তাই সংস্কারমূলক উদ্যোগের জন্য বিদ্যালয়গুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে বেছে নিতে হবে এবং স্থানীয় স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিতে হবে। 'শলা সিদ্ধি' নামক উদ্যোগের আওতায় সম্প্রতি দেশজুড়ে যে কর্মসূচি শুরু হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হল 'বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার' উদ্দেশ্যে একটি সর্বাত্মক জাতীয় নীতি প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করা। কেননা এই পরিকল্পনাই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় স্তরে দক্ষতা সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা গড়ে তোলা ও বিদ্যালয়কে নিজের বলে ভাবতে শেখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এই নীতিতে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের জন্য বিদ্যালয়ের ভেতরেই নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়া হবে। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের কথা ভেবে নতুন নতুন দক্ষতা ও জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের নেতাদের তৈরি করে নিতে বিদ্যালয়ের প্রশাসনকেও এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠ্যসূচি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক

পাঠ্যসূচির ওপর শিক্ষার মান অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার ওপর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাসের বইতে কোন কোন ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হবে তার আলাপ-আলোচনাতেই মূলত যাবতীয় প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির রূপরেখা ও বিষয়বস্তু ঢেলে সাজাতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নীতিগত উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষভাবে জোর দিতে হবে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কিছু প্রতিষ্ঠান বা STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি

ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত) বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেধাবী ও ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও গণিতে পারদর্শী করে তোলার একটা ধারা বর্তমানে দেখা যাচ্ছ বিশ্বজুড়েই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি অবহেলিতই রয়ে গেছে। প্রায়শই দেখা গেছে যে বিজ্ঞান ও গণিত যারা পড়াচ্ছেন তাদের বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগতযোগ্যতা থাকে না।

উচ্চ প্রাথমিকস্তরে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতি রচনার মাধ্যমে সমস্ত স্তরে বিজ্ঞানশিক্ষাকে যদি আকর্ষণীয় না করে তোলা যায় এবং বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে একেবারেই শৈশবেই যদি ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানশিক্ষায় মনোযোগী করে তোলা না যায় তাহলে আমাদের লক্ষ্যটা অধরাই রয়ে যাবে। দেশের যশস্বী বিজ্ঞানীদের যদি বিজ্ঞানের উঠতি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় এবং তাদের বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করানোর কাজে ব্রতী করা যায় তবে তারচেয়ে ভালো কর্মযজ্ঞ আর কিছুই হতে পারে না। IIT বা IISER-এর মতো দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের প্রতিষ্ঠান চত্বরে বা আশপাশের এলাকার বিশেষ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারে তাহলে এই ধরনের কর্মযজ্ঞ শুরু করা যেতে পারে। তাহলে ওই সমস্ত নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ পেশাদারেরা মাঝেমাঝে বিদ্যালয়স্তরে গিয়েও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাঠ দিতে পারবেন।

নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি ক্ষেত্রকে যুক্ত করার নয়া রূপরেখা

গত দু-দশক ধরে বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সাধারণত স্থানীয় জনসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং তাদের বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার জন্য এরা অনেকদিন ধরেই সওয়াল করে আসছে। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারে কর্পোরেট ক্ষেত্রও বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। দরিদ্রদের শিক্ষার দায়িত্ব যে শুধু সরকারের এই চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এখন অনেকটাই বেরিয়ে আসা গেছে। তবে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা—এই তিনপক্ষের যে উদ্যোগ তাকে প্রায়শই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে দেখা হয়। এখন এমন একটি সর্বাত্মক নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ না রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই অবশ্য মূল ভূমিকাটা পালন করতে হবে। কারণ শুধু বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চলতে গেলে দেশের বৈচিত্র বা সাম্যের নীতিকে সম্মান জানানোর আদর্শগুলো হয়তো হালে পানি পাবে না।

পরিশেষে

ভারতের মতো বৈচিত্রময় একটি দেশের জন্য নতুন নীতি প্রণয়ন যথেষ্ট কঠিন কাজ। এই কঠিন প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার সঠিক দিশাই দেখানো হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনে। সাম্যের অধিকারের নীতিকে প্রয়োগ করতে গেলে আগে বৈষম্যের অভিজ্ঞতাগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। এই কাজে কোন প্রতিষ্ঠান সহায়ক হবে আবার কোন প্রতিষ্ঠান বাধা দেবে সে বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। ঘোর অসাম্যগুলিকে দূর করা না গেলে সমাজে এমন কিছু অভিজ্ঞতা ও স্বার্থ জন্ম নেবে সেগুলির তল পাওয়া মুশকিল হবে। যে সমাজে বৈষম্য অত্যন্ত গভীর সেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে মতের আদান-প্রধান খুব কম। তারা একে-অপরের অভাব-অভিযোগ বুঝতে পারে না এবং অপরের অভাব বা কষ্ট বুঝতে গেলে নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগবে বলে তারা ভয় পায়। এই নতুন শিক্ষা নীতিতে একত্রে শিক্ষালাভ ও একসঙ্গে বসবাসের মূল্যবোধকে গেঁথে দিতে হবে। শুধু অলংকারসর্বস্ব না হয়ে এই নীতিকে যদি প্রকৃত পথের দিশারি হয়ে উঠতে হয় তাহলে এ দেশের বিপুল বৈচিত্রময় ভাষা ও সংস্কৃতি তথা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। যে শিক্ষা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জাগিয়ে তোলে সারা দেশে সেই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠেছে বার বার। নতুন শিক্ষানীতি যেন এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে।❑

[লেখক সামাজিক কল্যাণ পর্ষদের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।
email : aar.govinda@gmail.com]

শিক্ষার জন্য অর্থ-সংস্থান

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হতে হবে কমপক্ষে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ। বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৪ শতাংশ বা তার কাছাকাছি অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত। সরকারকে একদিকে শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াতে হবে অন্য দিকে তাদেরই শিক্ষা-সংক্রান্ত খরচের সিংহভাগ মেটাতে হবে এবং এ ব্যাপারে বেসরকারি ক্ষেত্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল হলে চলবে না। বিস্তারিত আলোচনা করেছেন **জনধ্যয়ালা বি জি তিলক।**

স্বাধীন ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা শুরু হবার ১৮ বছর পর ১৯৬৮ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হয়। আবার এর ঠিক ১৮ বছর পর শিক্ষা সংক্রান্ত দ্বিতীয় জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৬ সালে এবং ১৯৯২ সালে এই নীতির সামান্য সংশোধন করা হয়। গত কয়েক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন জাতীয় নীতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হচ্ছে, কারণ ইতিমধ্যে সাধারণভাবে দেশের সমস্ত ক্ষেত্রেই এবং বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের চালচিত্রটিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে, কোনও নতুন নীতি না থাকায়, প্রশাসনিক আদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে এবং এই উদ্যোগগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি নতুন জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ভার সম্পর্কিত কয়েকটি নীতিগত দিক সযত্নে পর্যালোচনা করা জরুরি। কারণ এটা সর্বতোভাবেই মেনে নেওয়া হয় যে অর্থ বারদ্দ করা বিষয়টি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর থেকে কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ওপর সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যায়।

সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষার গুরত্ব এবং এর সামাজিক দায়িত্বর দিকটি সর্বতোভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা সমাজে যে সুবিধাগুলি সৃষ্টি করে তা বহুমুখী, উন্নয়নের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সুদীর্ঘকাল ধরে এবং এমনকী প্রজন্মর পর প্রজন্ম ধরে এই সব সুবিধা চালিত হতে থাকে। যেহেতু শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, এবং বিশেষ করে এর বিভিন্ন বাহ্যিক দিকগুলিও রয়েছে, বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল এবং উন্নত সমাজেও শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দই শিক্ষার খরচ মেটানোর এক বড় উৎস। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাও এই মতকেই সমর্থন জানায়। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থা ইউনেস্কো-র মত হল শিক্ষাকে 'পাবলিক গুড'-এর পরিমণ্ডলের বাইরে এনে 'কমন গুড' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ শিক্ষার 'পাবলিক গুড' চরিত্রটি রক্ষা করে ও বিকশিত হতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে সর্বত্র সমানভাবে শিক্ষার প্রসার সুনিশ্চিত করে। একই সঙ্গে শিক্ষার ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি ফলপ্রসূ করা যেতে পারে এবং শিক্ষাকে 'কমন গুড' হিসেবে দেশের নাগরিক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করে তাদের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল রাষ্ট্রকে শিক্ষাখাতে দরাজ হাতে আর্থিক সহায়তা দিতে দৃঢ়ভাবে তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করতে হবে। বারবারই বলা হয়েছে ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হতে হবে কমপক্ষে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ। বর্তমানে এই লক্ষ্যর দিকটি ফিরে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যমাত্রাকেই ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা ধরে এগোতে হবে। অর্থ আসতে হবে সাধারণ ও বিশেষ কর থেকে (যেমন শিক্ষা সেস) এবং কর ব্যতিরেকে অন্যান্য রাজস্ব থেকে (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয় ক্ষেত্রেই)। বর্তমানে জাতীয় আয়ের ৪ শতাংশ বা তার কাছাকাছি অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ পৌঁছে দেবার দায়িত্বটিকে ঐকান্তিক ভাবে অনুধাবন করতে হবে।

শিক্ষাখাতে ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়ের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু এবং পরিষ্কার নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। যদিও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে তাদের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু অনেক রাজ্য সরকারই শিক্ষা খাতে তাদের বরাদ্দ পর্যাপ্তভাবে বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে না।

শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ লক্ষ্য হল শিক্ষার প্রসার ঘটানো (পরিমাণগত লক্ষ্য, যেমন সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মোট ৩০ শতাংশ ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা), কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন, যুবকদের দক্ষাত বৃদ্ধি, সমাজের দুর্বল শ্রেণির কাছে আরও বেশি করে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া, বিদ্যালয়-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের বিষয়টির উন্নতি ঘটিয়ে গ্রহণীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া

এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উঁচু মান এবং উৎকর্ষের বিষয়টিকে বেশি করে তুলে ধরা। নতুন নতুন বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার আরও বেশি প্রসারের পূর্বে প্রয়োজন হল বর্তমানের প্রতিষ্ঠানগুলিরই বেশি করে উন্নয়ন ঘটানো এবং এই উন্নয়নের বিষয়টিকে কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে মানব সম্পদ এবং অন্যান্য বস্তুগত কাঠামোর দিক থেকেও এই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গুণগত এবং উঁচু মানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং যে সব প্রয়োজনে এই বরাদ্দ সেগুলি হল : শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত বিবিধ উপকরণ গঠন যার মধ্যে যেমন রয়েছে চিরাচরিত উপকরণ এবং সেই সঙ্গে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি, পাঠাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু মানের গবেষণা। উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গবেষণা খাতে এবং সেই সঙ্গে সমতা ও মেধাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যয় করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রয়োজনের বিভিন্নতার ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে, একদিকে যেমন মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ভিত্তিতে তাদের পুরস্কৃতও করতে হবে।

যেহেতু শিক্ষা, যার মধ্যে সমাজের ধনী অংশের উচ্চ শিক্ষার বিষয়টিও রয়েছে, সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যেই এক গুচ্ছ সামাজিক সুবিধা সৃষ্টি করে; সুতরাং ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়ার পক্ষে অথবা তাদের ঋণের পক্ষে (বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে) তর্ক করার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভূতপূর্ব কমিটিগুলির সুপারিশ ছিল, এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের বাজেটের ২০ শতাংশ ছাত্রদের বেতন এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করার অনুমতি দিতে হবে। আর শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ (২০০৫)-এর পরিচালন সমিতির সুপারিশ ছিল, ওপরের ২০ শতাংশ সীমাকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে বিবেচনা করা যাতে উচ্চশিক্ষায় সমতার বিষয়টির সঙ্গে কোনও ভাবেই আপস করা না হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী সকলের জন্যই রয়েছে এক সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই নিঃশুল্ক শিক্ষা, আইনে সরকারি স্কুলে বেতন নেবার কোনও সংস্থানই রাখা হয়নি। একইভাবে শিক্ষার অধিকার আইনকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও অনুকূল যুক্তি রয়েছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এক শক্তিশালী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বাবদ পুরো অর্থটাই এসেছে রাষ্ট্র থেকে আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক দিকে সরকারের তরফে যেমন এসেছে প্রভূত পরিমাণ অর্থ, অন্যদিকে পুরো সমাজই উদার অর্থসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন, কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিবিশেষ, যাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরাও রয়েছেন। এই সব সমাজেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের থেকে প্রাপ্ত বেতন মোট অর্থের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। ভারতবর্ষে একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে যারা আর্থিক সহায়তার উৎসগুলি খুঁজে বের করবে, যেমন রাষ্ট্র এবং ছাত্র সমাজ ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন। এছাড়াও দেশে কর্পোরেট ক্ষেত্রগুলির জন্য যে সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সেই আইনের কিছু ধারাকে সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করা এবং উদ্ভাবনীমূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যার ফলে ব্যক্তিবিশেষ এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি শিক্ষা ক্ষেত্রে দান এবং এককালীন সাহায্য দিতে উৎসাহিত হতে পারে। একই সঙ্গে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যাতে মানবতা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত নয় এমন সংস্থা এবং লাভজনক বেসরকারি সংস্থাকে রাষ্ট্রের তরফে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দেওয়া না হয়, কারণ এই সব সংস্থার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে যদিও শিক্ষার গুণগত মানকে সংকীর্ণ মাপকাঠির বিচারে ভালোই বলা যেতে পারে, কিন্তু এই শিক্ষা মূল্যবোধের মাধ্যমে একটি জাতিকে গড়ে তুলতে সহায়ক নয়। সেই সঙ্গে শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেলটিও সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। কারণ এই সব মডেল পরিকাঠামো এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মডেল সন্তোষজনক না-ও হতে পারে, কারণ কাজের প্রকৃতিগত দিক, বৈশিষ্ট্য এবং কাজের ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার নিজস্বতা রয়েছে। সুতরাং সংক্ষেপে দাঁড়ায়—বিভিন্ন উন্নত দেশে ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লক্ষ করা গেছে যে রাষ্ট্রকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এই ভূমিকাটা উত্তরোত্তর বাড়িয়েও যেতে হবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের এই ভূমিকা পালন করতে হবে। যদিও অন্যান্য সূত্র থেকে সম্পদ সংগ্রহের কিছুটা সুযোগ রয়েছে, যেমন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী, অভ্যন্তরীণ উৎস, মানবতাবাদী সংগঠন প্রভৃতি, কিন্তু এই সব সূত্র থেকে সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ এবং নির্ভরশীলতার বিষয়টি গুরুত্বর সঙ্গে বিচার করতে হবে এবং বুঝতে হবে এই সব উৎসগুলি রাষ্ট্রের আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে বলা চলে, শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০-২০ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে, যে পরিকল্পনা আবার দেশে শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে এক দীর্ঘকালীন কৌশলগত পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে। জাতীয় পরিকল্পনাটিকে শিক্ষায় আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ নীতির ওপর দাঁড় করাতে হবে যে নীতির মধ্যে থাকবে পর্যাপ্ততা, সমতা এবং দক্ষতা। এ ধরনের পরিকল্পনা আগামী ১০-২০ বছর ধরে শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকভাবে অর্থের জোগান নিশ্চিত করবে, তবে এর সঙ্গে পুরস্কার এবং শাস্তি বিধানের ধারাগুলির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। ❑

[লেখক শিক্ষা-পরিকল্পনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
email : jtilak@nuepa.org]

শিক্ষায় প্রযুক্তি

অস্থির প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা

আনকোরা সব প্রযুক্তিকে ঘিরে বাসনা-কামনা হঠাৎ উপচে পড়ছে। এদিকটা মাথায় রাখা দরকার। বিশেষত, খেয়াল করা জরুরি যে এসব প্রযুক্তি কয়েক দশকের পুরোনো। এসব প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা কেন তুঙ্গে। কীসের আকাঙ্ক্ষায়। এসব নিয়ে এত ঢাক পেটানোরই বা কী আছে। লিখছেন **রাজারাম এস শর্মা।**

খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা কারণ হচ্ছে রঙিন পর্দা। একটা সময় তথ্যের একমাত্র উৎস ছিল বইপত্তর। তাও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদা-কালো হরফে ছাপা। কেউ কেউ অবশ্য তর্ক জুড়তেই পারে কেন রঙিন রঙিন পত্র-পত্রিকাও তো ছিল। ছিল রঙিন সিনেমা। এখন কিন্তু নিজের পছন্দসই রঙে, নিজেই বই-পত্রিকা ছাপানোর কথা ভাবা যেতে পারে অনায়াসেই। মধুমাস হাজির আলটপকা। নিঃসন্দেহে, এ এক মধুর অনুভূতি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সাজসরঞ্জামে ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ। আগে বইপত্র বলতে আমাদের চোখে ভেসে উঠত ছাপাখানার ছবি। আর হাতে কালিমাখা প্রিন্টিং প্রেসের ফর্মা। আজ আর ছাপাখানার ভরসায় বসে না থাকলেও দিব্যি চলে যায়। নিজের ঘরে এক কোণে বসানো ডিটিপি-তে সে কাজ সেরে ফেলা যায় অনায়াসে। একটা ডকুমেন্ট খুলে পছন্দসই হরফ বেছে নকশা ছকে ফেলার অপেক্ষামাত্র। এরপর পাশে রাখা লেজার প্রিন্ট থেকে ছাপানো কপি বের করলেই কাজ খতম। এমনকী, স্মার্ট ফোন থেকেও বিনা তারে লেজার প্রিন্টারে কাজ সারা যায়। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। দু-এক কপি আলোকচিত্রের জন্য কত না সাজসরঞ্জাম, কত না কসরত। সেলফির ব্যাপার-স্যাপার তখন কারও মাথাতেই আসত না। আর এখন? সেলফির দৌলতে নিমেষের মধ্যে ছবি ছড়িয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষজনের কাছে. ঝাঁ-চকচকে পত্র-পত্রিকাতেও অনায়াসে ছাপা চলে সে ছবি।

তৃতীয় কারণটা নিঃসন্দেহে সাজসরঞ্জামের সাইজ। যত্রতত্র কাছে নিয়ে রাখার সুবিধে, নানা কাজে লাগার গুণের দরুন হালকা-পাতলা জিনিসে মানুষের ঝোঁক বেশি।

চার নম্বর এবং আমার মতে সবচেয়ে বড় হেতু নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করাটা বেশ সহজ। আধুনিক সাজসরঞ্জামের মালিক এমন কেউ কি তা ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছে? না, অন্তত আমার জানা নেই। সাজসরঞ্জাম যত বেশি আধুনিক ও সূক্ষ্ম হচ্ছে তা ব্যবহার করাও তত বেশি সহজ হয়ে পড়ছে। বয়সটা অবশ্য কিছু ঝামেলা পাকায় বইকি! কম বয়েসিরা খুব তাড়াতাড়ি অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি চালানো শিখে যায়। *গোরিলা গ্লাস*-এর হালকা-পাতলা স্ল্যাব-এর পিছনে আঙুল ছোঁয়ালেই সফটওয়ারের কত না খেল। এ সবই নকশা বা ডিজাইন নিয়ে বিস্তর গবেষণার ফসল। এমনকী, খুব সন্দিগ্ধমনার কাছেও সফটওয়্যারের এহেন খেল ভেলকি মনে হবে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ফোন, মানচিত্র, ফটো, গান, ভিডিও, এমনকী কম্পাস, পিডোমিটার বা একটা রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে কয়েক লাইনের কোডে ঢোকাতে পারলে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও তা ব্যবহার করতে পারবে।

সুতরাং, এসব যন্ত্র আমাদের স্কুলগুলোতে আনার ইচ্ছে জাগাটাই স্বাভাবিক। এসব যন্ত্র এলে স্কুলে আমরা যা করি, তা আরও ভালোভাবে করা যাবে। লেখাপড়া আরও বেশি আগ্রহের খোরাক জোগাবে। পড়াশোনা ভালো লাগবে শিশুদের। ছাত্র, শিক্ষক ও স্কুলের কাজকর্ম সাফল্যের তুঙ্গে উঠবে। এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে একটু পরে। এখন দেখা দরকার, স্কুল, শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা ঠিক কী চাই?

ছাত্রদের শেখার ক্ষমতায় স্কুলে লেখাপড়া হচ্ছে এক ধরনের বিনিয়োগ। স্কুলে বেশ কয়েক বছর ধরে লেখাপড়ার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের চারপাশের তথ্যাদি খোঁজখবর, জোগাড় ও কাজে লাগানো। তথ্যাদি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আমাদের জীবন ও বিশ্বের উপর প্রভাবকারী ঘটনাবলি কাজে লাগানোর জন্য ছাত্ররা ভাষা ও অঙ্ককে ব্যবহার করাও শেখে। এই প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, ব্যক্তির সম্ভাবনা বিকাশ, জীবনের মানোন্নয়নে সাফল্য বৃদ্ধির জন্য স্কুলে লেখাপড়া এক বিনিয়োগ বিশেষ। সুতরাং, এসব লক্ষ্য অর্জনে আমাদের ক্ষমতা বাড়ানো হবে প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে।

বৌদ্ধিক বা বস্তুগত কিংবা অনেক ক্ষেত্রে উভয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের নতুন যাত্রাপথে পাড়ি দেওয়া শুরু করছে। ঐতিহাসিক কারণে বোঝার ভার কাঁধে নিয়ে তাদের পথ চলা শুরু। এই ভার সামলে তাদের এগোতে হবে। তবেই তারা পারবে আধুনিকতার ফসল তুলতে। আমাদের সমাজের জন্য শিক্ষা যতই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হোক না কেন, বহু মানুষের কাছে এখনও তা অধরা। শিক্ষার খরচ কমানো, কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা সকলের নাগালে আসার জন্য প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করতে হবে। বাধাবিপত্তির খাড়াই ধাপ কাটিয়ে ভালো রকমের সুফল মেলে যেন। স্কুলছুটের হার যথেষ্ট কমা উচিত। বিনিয়োগের সার্থকতা যাচাইয়ের সেটাই পরাকাষ্ঠা।

উন্নয়নের পথ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশে, উন্নত জগতের নাগাল পাবার

বোধবুদ্ধিহীন তাড়নায় আমরা গাদাগুচ্ছের টাকা ঢেলেছি উচ্চ শিক্ষা খাতে। সেই শিক্ষার মাধ্যম আবার ইংরেজি। গুটিকয়েক প্রতিভাবানের ঝলক দেখে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। খরচপাতি সার্থক হয়েছে। কিন্তু প্রদীপের নীচে ঢালাও আঁধার। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছনে বহু খরচ করে পেয়েছি ঝাঁক-ঝাঁক অতি সাধারণ পড়ুয়া। সমাজে শিকড় গেড়েছে এক নব্য শ্রেণি। কঠোর শ্রম, উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে এরা দেখে নিচু চোখে। আমাদের মূল, আমাদের ভাষা, আমাদের কৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা। জ্ঞানের অন্বেষণে আমাদের যুবাদের উৎসাহিত করার জন্য এটা আদৌ কোনও ব্যবস্থাপত্র হতে পারে না। ভাষা হারিয়ে ফেললে খোয়াতে হবে কৃষ্টিগত পরিচিতি। এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়বে আমাদের সামাজিক কাঠামোর বুনোট। একদিকে আজকের প্রযুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণ সহজ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে, একটু আগে বলা সব বাধাবিপত্তি তা দুরূহ করে তোলে। প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের সুফল পেতে শিক্ষায় বিনিয়োগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধরানো বোধহয় জরুরি।

ভারতে শিক্ষার সমস্যাদি নিয়ে তাই ভালোরকম বোধবুদ্ধি বা জ্ঞানগম্যি থাকা দরকার। প্রযুক্তিগত উপাদানের আকার-প্রকার বুঝতে-সুঝতে এর কয়েকটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত পটভূমি খুঁজে বের করার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ থেকে ব্যষ্টিগত সাফল্যের নজির হাতড়ানোর দরকার নেই। পাশ্চাত্যে বিনিয়োগের যথেষ্ট সংগতি আছে। তা সত্ত্বেও প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের দরুন দেখা গেছে উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্র থাকলেই শিক্ষাদীক্ষায় চমকপ্রদ ফল নিশ্চিত করা যায় না। কেউ জোর দাবি তুলতে পারে যে, প্রযুক্তি কী করতে পারে তার অসাধারণ সব নজির আছে। তবে মোটের উপর, গবেষকরা খেদের সঙ্গে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, প্রযুক্তি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ।

তাই বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা ভালো। বিশেষত 'আসুন সব শিশুর জন্য ট্যাবলেট কিনি'-এর মতো ক্ষেত্রে। তবে শিক্ষায় সঠিক ডিজাইনের প্রযুক্তিতে অবশ্যই আস্থা পোষণ করতে হবে। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রযুক্তিই পারে মুশকিল আসানের ভূমিকা নিতে। কিছু কিছু প্রযুক্তির অপার সম্ভাবনা আছে। এমনকী কট্টর সমালোচকদের মুখ চুপ করাতেও তা বাধ্য করবে। এ ধরনের কিছু সম্ভাবনা ও উদ্যোগ খুঁটিয়ে দেখা যাক।

বিদ্যালয়ের সংখ্যায় ভারত বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ। প্রতিটি জনবসতির ধারেকাছে একটা না একটা স্কুল চোখে পড়বে। তবে কি না, এত বেশি স্কুলের জন্য লাইব্রেরির মতো সহায়সম্পদের পর্যাপ্ত সংস্থান করাটা দস্তুরমতো চ্যালেঞ্জ।

ডিজিটাল ও ডিজিটাইজড প্রযুক্তি খুব জনপ্রিয়। ওয়েব পোর্টালের কথা সবার জানা। উইকিপিডিয়ার মতো এনসাইক্লোপিডিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতেও এ ধরনের পোর্টাল সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে চলেছে। দেশের লোকের চাহিদা ও আমাদের কৃষ্টি সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায়। স্কুলমহলে ন্যাশনাল রিপেজিটরি অফ ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস (http:/nroer.gov.in)-এর কদর যথেষ্ট। সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষক ও অন্যান্যদের শামিল করার মাধ্যমে এই উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক অংশীদারিত্বের মঞ্চে জড়ো করছে। উচ্চ শিক্ষায় এ ধরনের প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম খড়্গপুর আইআইটি-র প্রকল্প ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানভাণ্ডার ই-জ্ঞানকোষ।

দ্বিতীয় এক জনপ্রিয় প্রযুক্তি হচ্ছে অনলাইন কোর্স ডেলিভারি। 'ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস' যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। সাধারণ্যে এটা এমওসিসি-MOOC বলে পরিচিত। ন্যাশনাল মিশন ফর এডুকেশন থ্রু আইসিটি (NMEICT)-র একটি উদ্যোগ হচ্ছে NPTEL কোর্স (https://onlinecourses.nptel.ac.in/)। প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি এই পোর্টালে ইতিমধ্যে কয়েকশো কোর্স আছে। এই সব কোর্স বেশ জনপ্রিয়। এ ধরনের উদ্যোগ আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগেরও। তাদের ই-পিজি পাঠশালা পোর্টাল স্নাতকোত্তর স্তরে বহু বিষয়ে পাঠক্রম বিকাশে গুরুত্ব দেয়।

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ইস্তক শিক্ষকের আকাল। ঘনায়মান এই সংকটে মুশকিল আসান হতে পারে MOOC। স্কুলস্তরে শিক্ষণের মানোন্নয়নেও এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। স্কুল শিক্ষকদের সাধারণত ইন সার্ভিস ট্রেনিং হয়। এত বেশি শিক্ষকের জন্য ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ (ক্যাসকেড মডেল)-এর ব্যবস্থা আছে। একজন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ দেন একদল প্রধান রিসোর্স পার্সনকে। তাঁরা আবার প্রশিক্ষণ দেবেন অন্যান্য রিসোর্স পার্সনকে। শেষোক্তরা প্রশিক্ষণ দেবেন শিক্ষকদের। এই ব্যবস্থার খামতি হচ্ছে প্রশিক্ষণের মানে অভিন্নতা রাখা দায়। আর শিক্ষকরা সংখ্যায় বহু হবার দরুন তাদের পূর্ণাঙ্গ ও ঘন ঘন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাটাও বেজায় সমস্যা। অনলাইন বা ডিজিটাল কোর্স এ ক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকা নিতে পারে।

অবাধ শিক্ষাগত সম্পদ সম্পর্কে বাড়ছে সচেতনতা। এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকলে তা কাটানোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারতীয় ভাষাগুলিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রাসঙ্গিক। খরচপাতি ও দক্ষতার অভাবে অনুবাদের কাজে অনেক সময় গা লাগানো হয় না। ওয়েবে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়ছে। বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ ইনিশিয়েটিভস (http://www.tdil_dc.in/) ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য বহু সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ও টুল তৈরি করেছে।

এসব উদ্যোগ এক শুভ লক্ষণ। কম্পিউটার ব্যবহারে সক্ষম ও অক্ষমদের মধ্যে ভেদাভেদ এতে দূর করা যাবে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারে উৎসাহ বাড়াতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে সবাই যেন জানতে-বুঝতে পারে, ওয়াকিবহাল থাকে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে ও পারে তার অংশীদার হতে।❑

[লেখক NCERT-র সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি-র শীর্ষকর্তা।
email : rajaramsharma@gmail.com]

মেয়েদের শিক্ষা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

শিশুরা জীবনের প্রথম পাঠ পায় যে বিদ্যালয়ে সেখানে একটি বৈষম্যহীন ও পক্ষপাতমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশুকাল থেকেই যদি তাদের মনে নারী-পুরুষ বা সমাজের জাতপাতের বৈষম্যের ছবিটা গাঁথা হয়ে যায় তবে তার প্রভাব থেকে যায় সারা জীবন। শিক্ষাবিদদের অনেক প্রতিবাদ ও লেখালেখি সত্ত্বেও পরিস্থিতির বদল হয়নি বিশেষ। এখনও শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের ছবিতে, শব্দ চয়নে সামাজিক বৈষম্যেরই প্রতিফলন। কীভাবে বেরোবে সমাধানের পথ? আলোচনা করেছেন **বিমলা রামচন্দ্রন।**

শিক্ষাব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং বুনিয়াদি শিক্ষায় মেয়েদের সুযোগ আরও বাড়ানোর প্রশ্নটি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এবং এই তিনটি বিষয় আবার একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি হল—সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং অর্থনীতি; সর্বোপরি সমাজ ও সংস্কৃতি (নীচের ছকে বিষয়টি বিশদে বর্ণনা করা হল)। এই বিষয়টিকে নিয়ে নতুন করে আলোচনার দরকার নেই, কারণ বিষয়টি এখন মূলস্তরের বিচার-বিশ্লেষণের অন্তর্গত।

বৃহত্তর সামাজিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রেক্ষিতেই যে লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিত সে বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। বিপুল বৈচিত্রের দেশ এই ভারতের সর্বত্রই চোখে পড়ে বৈষম্য। আর্থ-সামাজিক অসাম্যের সঙ্গে লিঙ্গসম্পর্কের জটিল সমীকরণ মিশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথ হয় সহজ, না হয় কঠিন করে তোলে।[১] অর্থনৈতিক অসাম্য বা সামাজিক বৈষম্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও রীতি-নীতি, তথা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে কিছু গবেষকের মত (কলক্লো এবং অন্যান্য, ২০০০[২])।

এই কারণেই ভারতের ক্ষেত্রে দারিদ্র, সামাজিক অসাম্য ও লিঙ্গ সম্পর্কের পারস্পরিক সমীকরণকে ভালোভাবে বোঝা দরকার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে এই বিষয়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অঞ্চলভেদে কোনও কোনও বিষয়ের প্রভাব কম বেশি হয়ে থাকে এবং কোন অঞ্চলে কোন বিষয়টির প্রভাব বেশি কোনটার কম তা বুঝে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করাটা আজকের দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।[৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে স্বীকার করে নেওয়াও প্রয়োজন—

- বিদ্যালয়ে নথিভুক্তি, উপস্থিতি এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য নারী ও পুরুষের বৈষ্যমের চেয়ে অনেক বেশি লক্ষণীয়।
- লিঙ্গবৈষম্য বা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্যের চেয়ে তথাকথিত অগ্রসর ও অনগ্রসর এলাকা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার বৈষম্য অনেক বেশি প্রকট।
- লিঙ্গবৈষম্য বা সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্যের তুলনায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার ও সমাজের ওপরতলার মানুষের মধ্যেকার অসাম্য অনেক বেশি গভীর।
- বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়, তপশিলি জাতির আওতাভুক্ত কিছু বিশেষগোষ্ঠী (সাব-সেকশন), ছাড়াও বিভিন্ন অগ্রসর সম্প্রদায়/খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেও গভীর বৈষম্য রয়ে গেছে।
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য থাকলে একটি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও বৈষম্য জন্ম নেয়। যেমন, কোনও কোনও উপজাতির শিক্ষাগত অবস্থান অন্যান্য উপজাতির তুলনায় অনেক উন্নত বা অনেক দলিতগোষ্ঠী শিক্ষার বিচারে অন্যান্য দলিতগোষ্ঠীর তুলনায় এগিয়ে।

১৯৯০-এর দশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যালয় রয়েছে কি না (বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ/জোগান) তা খতিয়ে দেখার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য বিশ্লেষণের বেশিরভাগ কাজ শুরু হয়। এখানে 'চাহিদা' বলতে পরিবারগুলি তাদের সন্তান বিশেষ করে তাদের কন্যাসন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী কি না সেটিকেই বোঝাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর পর বোঝা গেছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এভাবে চাহিদা ও জোগানকে আলাদা ভাবে বিচার করা যায় না। লোকালয়ের মোটামুটি কাছাকাছি বিদ্যালয় থাকলে এবং সেই বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত পঠন-পাঠন হলে চাহিদা অবশ্যই বাড়বে (রেখা ওয়াজির, ২০০০[৪])। অন্যদিকে, বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত পঠন-পাঠন বা কাজকর্ম না হলে এবং নিজেদের কন্যাসন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে বিদ্যালয়গুলির ওপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা না থাকলে চাহিদা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। কোনও একটি অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বিদ্যালয় রয়েছে কি না তার ওপর পরিবারগুলির সিদ্ধান্ত অনেকাংশে নির্ভর করে [রামচন্দ্রন এবং অন্যান্য, (সাপ এবং মই)

২০০৪; সুব্রমনিয়ান, ২০০২, PROBE, ১৯৯৯[৫])। বিদ্যালয়ের ভেতর কী ঘটনা ঘটছে বা কোন কোন কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে সে বিষয়ে যেসব গবেষণা চালানো হয়েছে তাতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের মনের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সম্প্রদায়ের সহপাঠীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কথাবার্তার প্রভাবের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে (রবার্ট জেনকিনস, ২০০৫, গীতা নাম্বিসান, ১৯৯৬, ২০০০ এবং ২০০১, বিমলা রামচন্দ্রন এবং তারামণি নাওরেম, ২০১৩[৬])। এমভি ফাউন্ডেশনের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের বিদ্যালয় থেকে দূরে সরে থাকার কারণগুলিকে চিহ্নিত করা গেছে এবং সেইসঙ্গে শ্রেণিকক্ষের যে আচার-আচরণ কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকা/প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কার এবং পাঠ্যসূচি, সামাজিক পক্ষপাত/বৈষম্যমূলক ধ্যানধারণা বা নারী-পুরুষের ছকবাঁধা ভূমিকাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে সেগুলির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

থাইল্যান্ডের জোমটিয়েনে ১৯৯০ সালের ইএফএ সম্মেলনের চব্বিশ বছর পর এখন স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ফারাকটা বেশ চোখে পড়ার মতো যা সারণি-১-এ স্পষ্ট।

শিক্ষার ওপর নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণের প্রভাবের সামগ্রিক ছবিটি প্রকাশ করা অত সহজ নয়। বিভিন্ন স্তরের বৈষম্য তথা জাতপাত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক নানান বিষয়ের ওপর বাড়তি গুরুত্বের ফলে শুধু নথিভুক্তি বা এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার চিরাচরিত মাপকাঠি দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার করা যাবে না। এজন্য বিদ্যালয়ে বালক-বালিকার কী অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার গভীরে ঢুকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ বা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলির কার্যকারিতা বিচার করার জন্য যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় তা দিয়ে আর যাইহোক সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে থাকা অসাম্যগুলির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। আর এই অসাম্যগুলিকে আরও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

সারণি-১
বিভিন্ন শ্রেণিতে সাক্ষরতার হারে অসাম্য

	জনগণনা ২০০১	জনগণনা ২০১১
গ্রামাঞ্চলের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা	৩২.৪	৪৬.৯
গ্রামাঞ্চলের তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা	৩৭.৬	৫২.৬
গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মহিলা	৪৬.১৩	৫৭.৯
তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বাকি মহিলা	৫০.২	৬১.১
গ্রামাঞ্চলের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ	৫৭.৪	৬৬.৮
শহরাঞ্চলে তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা	৫৭.৫	৬৮.৬
শহরাঞ্চলের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা	৫৯.৯	৭০.৩
গ্রামাঞ্চলের তপশিলি জাতিভুক্ত পুরুষ	৫৩.৭	৭২.৬
গ্রামাঞ্চলের সমস্ত পুরুষ	৭০.৭	৭৭.১
শহরাঞ্চলের সমস্ত মহিলা	৭২.৮৬	৭৯.১
তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বাকি পুরুষ	৭৪.৩	৭৯.৯
তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া শহরাঞ্চলের বাকি মহিলা	৭৫.৫	৮১.০
শহরাঞ্চলের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ	৭৭.৮	৮৩.২
শহরাঞ্চলের তপশিলি জাতিভুক্ত পুরুষ	৭৭.৯	৮৩.৩
শহরাঞ্চলের সমস্ত পুরুষ	৮৬.২৭	৮৮.৮
তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া শহরাঞ্চলের বাকি পুরুষ	৮৭.৬	৮৯.৭

সূত্র : মেরি লাল এবং এস শ্রীনিবাস রাও ২০১১[৪, ৮]-এর রচনা থেকে বিমলা রামচন্দ্রন কর্তৃক গৃহীত।

সারণি-২
বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিদ্যালয়ছুটদের হারের ক্ষেত্রে ফারাক—২০১০-১১

প্রাথমিক শ্রেণি প্রথম থেকে পঞ্চম		বুনিয়াদি শ্রেণি প্রথম থেকে অষ্টম		মাধ্যমিক শ্রেণি প্রথম থেকে দশম	
তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালক	৩৭.২	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকা	৫৫.৪	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকা	৭১.৩
তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকা	৩৩.৯	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালক	৫৪.৭	তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালক	৭০.৬
তপশিলি জাতিভুক্ত বালক	২৯.৮	তপশিলি জাতিভুক্ত বালক	৪৬.৭	তপশিলি জাতিভুক্ত বালক	৫৭.৪
সমস্ত বালক	২৮.৭	সমস্ত বালিকা	৪১.০	তপশিলি জাতিভুক্ত বালিকা	৫৪.১
সমস্ত বালিকা	২৫.১	সমস্ত বালক	৪০.৩	সমস্ত বালক	৫০.৪
তপশিলি জাতিভুক্ত বালিকা	২৩.১	তপশিলি জাতিভুক্ত বালিকা	৩৯.০	সমস্ত বালিকা	৪৭.৯

সূত্র : SES, ভারত সরকার, ২০১২।

শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গসাম্য তথা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোতে গেলে নারী-পুরুষের বিষমসত্ত্ব প্রকৃতির বাস্তবতা এবং তার বিভিন্ন অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই এগোতে হবে। ভারতের জটিল সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই লিঙ্গবৈষম্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিহিত রয়েছে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও একদিকে বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্থানীয় বৈষম্য এবং অন্যদিকে,

প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ভারতে আমরা কী করতে পারি?

শিক্ষার প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি

শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে আরও বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়, উন্নত পরিকাঠামো, বিদ্যালয়ে সর্বজনীন নথিভুক্তি, আরও ভালো PTR নিশ্চিত করা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত চরিত্র গঠন হচ্ছে কি না বা ছাত্রছাত্রীরা আদৌ কিছু শিখতে পারছে কি না সেটা খতিয়ে দেখাই সবচেয়ে জরুরি। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় পঠন-পাঠনের সুযোগ করে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত বালক-বালিকাকে যুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ করে দেওয়াটাই এখানে বড় কথা। বিদ্যালয়ের দরজায় শিশুদের আনা থেকে শুরু করে শিক্ষা বিতরণ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে অর্থবহভাবে তাদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। তারা বিদ্যালয়ে আসতে না পারলে, বিদ্যালয়কে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি সামাজিকগোষ্ঠীর প্রত্যেক শিশুর কাছে বিদ্যালয়ের দরজা যেন খোলা থাকে। বিদ্যালয়ে একবার ভর্তি হওয়ার পর সেখানে এলোমেলোভাবে কিছু দক্ষতা অর্জনের পরিবর্তে নিজেদের সুপ্ত সমস্ত প্রতিভা নির্ভয়ে মেলে ধরার অনুকূল পরিবেশ তারা যেন খুঁজে পায়। সেখানে যেন তারা নির্দ্বিধায় শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারে। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাও যেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন বুঝে তাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়তি মনোযোগ দিতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও বৈষম্যের ভয় দূরে সরিয়ে যেকোনও সামাজিকগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে পাবে ও তা প্রকাশ করতে পারবে তখনই শিক্ষার সুযোগ প্রকৃত অর্থবহ হবে।

শিক্ষার সুযোগ প্রকৃত অর্থে অর্থবহ হলে বিদ্যালয়ছুটদের সংখ্যা কমবে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তরণ অনেক সহজ হবে, উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে এবং সর্বোপরি উন্নত মানের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্ত শিশু সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ

আমরা যে সমাজে বাস করি বিদ্যালয়গুলি তারই প্রতিচ্ছবি। সমাজের পারস্পরিক এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্কের প্রচলিত ছবিটি প্রায়শই ধরা পড়ে বিদ্যালয়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যদি এ বিষয়ে সংবেদনশীল করে না তোলা যায় বা তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দেওয়া হয় তাহলে তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন আচার-আচরণ বিদ্যালয়ের পরিবেশের ক্ষতি করবে। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা বৈষম্যের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনোভাবকেই অজুহাত হিসাবে খাড়া করেন শিক্ষা জগতের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদরা। বিশ্বের আরও যেসব দেশ সাফল্যের সঙ্গে যেভাবে এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করেছে এবং সমস্ত বিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে সংবিধানে বেঁধে দেওয়া অধিকার ও দায়-দায়িত্বগুলির পালন বাধ্যতামূলক করেছে তা থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। সাম্যের অধিকার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকারকে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই বিদ্যালয়গুলিতে বৈষম্যহীন, পক্ষপাতহীন এক পরিবেশ সুনিশ্চিত করাটা শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রশাসকের আবশ্যিক কর্তব্য। জাত-পাত, ধর্ম, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থানের নিরিখে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভেদাভেদ করার অধিকার কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা বা প্রধান শিক্ষকের নেই। সংবিধানের এই আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসক ও স্থানীয় নেতাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার লঙ্ঘন আদতে দণ্ডনীয় অপরাধ। সেইসঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটি আদর্শ আচরণ বিধির কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত। এই লিখিত আচরণ বিধি সমস্ত বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুনির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে টাঙিয়ে রাখতে হবে যাতে তা সবাই দেখতে পায়। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিশেষ করে বালকদের এমন সব কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে যাতে তারা বৈচিত্রের মর্ম বোঝে, পার্থক্যকে সম্মান করতে শেখে এবং বিদ্যালয় স্তরে অন্যান্য শিক্ষার্থী বিশেষত বালিকাদের প্রতি তাদের আচার-আচরণের বিধি স্থির করে দিতে হবে। সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের শিশুদের যুক্ত করা গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য বা পক্ষপাতমূলক আচরণ না করার ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওপরও নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যাবে (রামচন্দ্রন ও নাওরেম, ২০১৪)।

বর্তমানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুধু কিছু প্রশাসনিক কাজকর্ম ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তাছাড়া প্রশিক্ষণকালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লান্তি ও অবসাদের কথাও এখন আরও বেশি করে শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমগুলিতে মূল বিষয় এবং সেই সঙ্গে শিক্ষণ প্রণালীর ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই বিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে বৈষম্যহীন, পক্ষপাতমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যেতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা তথা ভাববিনিময়ের জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থাপনা বা মঞ্চ যদি গড়ে তোলা যায়, তবে সেটা একটা বড় কাজ হবে। বিদ্যালয়গুলিতে যে বৈষম্য রয়েছে তা নিয়ে আমাদের এবার সত্যিই মাথা ঘামাতে হবে এবং স্থায়ীভাবে এই ছবিটা বদলানোর জন্য প্রতিটি স্তরে আন্তরিকভাবে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এর কোনও সহজ, সরল পথ নেই। সরকার এবং নাগরিক সমাজ—উভয় পক্ষকেই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে (রামচন্দ্রন এবং নাওরেম, ২০০৩, প্রকাশিতব্য)।

পাঠ্যসূচিকে শুধু পক্ষপাতমুক্ত হলেই চলবে না, বরং সেই পাঠ্যসূচি যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে এবং জ্ঞানার্জনের সময় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারে, তা দেখতে হবে।

'পড়ার বই থেকে আমি জেনেছি ছেলেরাই নাকি শুধু রাজা আর সেনা হতে পারে। তারপর অন্য একটা বইতে কত বীরাঙ্গনা রানিদের কথা পড়লাম; তারাও তো রাজ্য শাসন করেছেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

স্কুলের বইতে আমি পড়েছি ছেলেরাই নাকি শুধু ডাক্তার হয়।

একদিন আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়ে দেখি তিনি তো একজন মহিলা!

পড়ার বইতে আমি পড়েছি এ দেশে ছেলেরাই নাকি শুধু চাষবাস করে।

তারপর একদিন ট্রেনে যেতে যেতে রাস্তার দুধারে মাঠে ঘাটে ধানখেতে কত মেয়েকেই তো কাজ করতে দেখতে পেলাম।

একটা আসল সত্যি শিখে নিলাম আমি...যা দেখি তাই শিখি।'

[পূজা, রম্যা, অনুজ, বরোদার 'উৎকর্ষ' প্রতিষ্ঠানের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক বিষয় সংক্রান্ত [ফোকাস গ্রুপের (NCF, ২০০৫) তাদের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত—NCERT, ২০০৫]

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে যাতে কোনও মোটাদাগের বা সূক্ষ্ম কোনও সংস্কারের ছাপ অথবা নারী-পুরুষের ছকে-বাঁধা কিছু ভূমিকার কথা না থাকে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও শোরগোল ওঠার দু-দশকেরও বেশি সময় পরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এখনও পাঠ্যপুস্তকগুলিকে কোনও না কোনওভাবে নারী-পুরুষের ফারাক বা সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। পুরুষ, নারী বা বিভিন্ন জাতের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা-আলাদা কাজের চিরাচরিত ধারণা এখনও রয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকে ছবি, শব্দচয়ন বা উদাহরণের মাধ্যমে খুব কৌশলে এই চিরাচরিত ধারণাটাকেই স্বয়ংসিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। শহর ও গ্রামের ছকে-বাঁধা গতানুগতিক ধ্যানধারণাগুলিকে শুধু যে উস্কে দেওয়া হয় তাই নয়, উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামের তুলনায় শহরকে বা উপজাতিদের তুলনায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়ে বেশিরভাগ উদাহরণই মূলত শহরকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। বীর এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সবসময় পুরুষ। আর সেবা-শুশ্রূষাকারী ও গৃহের তত্ত্বাবধানকারীরা অবশ্যই মহিলা। এই বাস্তব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে NCF ২০০৫-এর ফোকাস গ্রুপে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছিল—যে ব্যবস্থার মধ্যে শিশুদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শিক্ষা তারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই নাগরিক হিসাবে প্রকৃত অর্থে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, শিশুদের বিশেষ করে বালিকাদের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ-প্রণালী উদ্ভাবন করা আবশ্যক যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজের অধিকার প্রয়োগ তথা নিজেদের পছন্দ-অপছন্দগুলি বেছে নেওয়ার জন্য নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে পারে। শুধু আচরণের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে সমতা বজায় রাখা নয়, বরং ফলাফলের ক্ষেত্রে সমতা অর্জনই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বরং আচরণের ক্ষেত্রে কিছুটা অসাম্য থাকা দরকার, যেমন সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাছে ফলাফলের সমতার সুফল পৌঁছে দিতে গেলে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন (NCF, ২০০৫, ফোকাস অন জেন্ডার ইস্যুজ অন এডুকেশন) এই লক্ষ্যপূরণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, পাঠ্যসূচি প্রণেতা, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ তথা বিদ্যালয়গুলির ওপর নজরদারির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি—সকলকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁদের একযোগে তাৎপর্যপূর্ণ ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। আচরণ বা ফলাফলের সাম্য প্রতিষ্ঠার পরও আরও বৃহত্তর বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। একমাত্র পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতার ধ্যানধারণা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে বৈচিত্র ও পার্থক্যকে সম্মান জানানো ও যে কোনও বৈষম্য থেকে সতর্ক হওয়ার শিক্ষা তাদের দেওয়া যেতে পারে। অপরকে সম্মান করার শিক্ষা দিতে হবে ছেলেদের। তাদের শেখাতে হবে যখন অন্য কোনও ব্যক্তি 'না' বলবে তখন তারা যেন সেই মতামতের মূল্য দেয়। এক সঙ্গে কোনও কাজ 'পুরুষালি' আবার কোনও কাজ 'মেয়েলি' বলে যে লক্ষণরেখা টেনে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোলে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বুঝতে পারবেন যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ফারাকগুলি শিক্ষার্থীরাও বিনাযুক্তিতে মেনে নিচ্ছে না, বরং তারা—"এই ধ্যানধারণার নেপথ্যের কারণগুলিকে কাটাছেঁড়া করে দেখতে শিখছে এবং এই ধরনের ধ্যানধারণা চলতে থাকলে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করছে এবং এই অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য 'বিশেষ' ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলারও চেষ্টায় নামছে তারা...মেয়েরাও লিঙ্গবৈষম্যসম্পন্ন এক সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়ে চলে। মাত্রাটা হয়তো বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও জনসম্প্রদায় এবং শহর-গ্রাম ভেদে আলাদা আলাদা হতে পারে। এর ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাসের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই পার্থক্যগুলিকে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে শিক্ষার্থীরা তাদের অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে পারে এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্যের মূল্য বুঝে সেগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে..." (NCF, ২০০৫, ফোকাস অন জেন্ডার ইস্যুজ অন এডুকেশন)।

পরিশেষে

আরও হয়তো অনেক কিছু বলা যেতে পারত। শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটা লম্বা তালিকাও তুলে ধরা যেত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে নানা কমিশন এবং কমিটি বিভিন্ন বিষয়, ভাবনাচিন্তা ও কর্মপরিকল্পনার লম্বা তালিকা পেশ করেছে। কিন্তু এখনও সেইসব সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার রূপায়ণ ঘটানো যায়নি

কেন? আমার মনে হয় প্রধান নীতিগুলির বিষয়ে সবার প্রথমে আমাদের সহমত হতে হবে। এই মূলনীতিগুলি যদি অনুসরণ করা যায় তাহলে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে। এই কারণেই আমি তিনটি মূলনীতির ওপরই আলোকপাত করেছি। প্রথমত, শিক্ষার প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত, বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তৃতীয়ত, জ্ঞানার্জনের সময় নারী-পুরুষের বৈষম্যের চিত্রটাকে চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া। এই তিনটি নীতি আমরা যদি মেনে চলি তাহলে লিঙ্গসাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে আমরা একধাপ এগোতে পারব।❑

[লেখক মৌলিক শিক্ষা, মেয়েদের শিক্ষা ও নারীদের ক্ষমতায়ণ নিয়ে কাজ করছেন। তিনি 'মহিলা সমক্ষ' (নারী সাম্যের জন্য শিক্ষা)-এর রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই প্রকল্পের প্রথম জাতীয় প্রকল্প নির্দেশকও ছিলেন (১৯৮৮-৯৩, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার)। ১৯৯৮ সালে তিনি এডুকেশনাল রির্সোস ইউনিট (বর্তমানে ERU কনসাল্টেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড) গঠন করেন। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি NUEPA-তে 'ন্যাশনাল ফেলো' এবং 'শিক্ষক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন'-এর অধ্যাপক ছিলেন।
email : erudelhi@gmail.com]

উল্লেকপঞ্জি :

1 This phrase "heterogeneous gendered realities and multiple disadvantages" has been taken from the NCERT report 3.2 – National Curriculum Framework 2005, Position Paper on Gender Issues in Education, New Delhi, 2005. This paper is a combination of the EFA Mid-decade assessment commissioned by NUEPA in 2007 and Gendered Inequality in Education published in Devaki Jain and C P Sujaya (Ed), Indian Women Revisited. Publications Division, Ministry of Information and broadcasting, Government of India, New Delhi, 2014.

1 "There are well-known substantial differences in well-being across social groups in India... Average per capita income of SC/ST at all-India level is about one-third lower than among other groups, Headcount poverty among other (non-deprived groups in 1999/2000) was 16%, 30% for minorities (Muslims), 36% for SC and 44% for ST... Deprived groups also have lower literacy than other groups... Ranking on neonatal, post-natal, infant, child and under-5 mortality indicators for socially-excluded groups are similar to othose of other indicators (e.g. IMR for SC and ST are about 84 and 62 for non-deprived groups). Arjan D Haan : Disparities within India's Poorest regions : Why do the same institutions work differently in different places? in Equity and Development : World Development Report 2006 Background Papers, World Bank, Washington DC, 2004.

2 C Colclough, P Rose and M Tembon : Gender inequalities in primary schooling : The roles of poverty and adverse cultural practices : International Journal of Educational Development, Vol. 20, 2000, pp 5-27

3 Naila Kabeer and Ramya Subramaniam highlighted the "gender intensified disadvantage" whrein "the specific forms of disadvantage faced by girls and not boys that it is also important to acknowledge and that related to roles for girls deriving from gender division of labour, their reproductive cycles and perceptions of risk and vulnerability to sexual violence. These gender-specific forms of disadvantages (Kabeer and Subramaniam, 1999) need to be identified and distinguished from those that are gender intensified in order to facilitate the identification of suitable social policies..." Ramya Subramaniam, UNRISD, 2002

4 Rekha Wazir, 2000

5 Ramya Subramaniam : Gender and Education : A Review of Issues for Social Policy, UNRISD, Geneva, 2002; PROBE, 1999)

6 Nambissan, Geetha B. 1996. Equity in Education? Schooling of Dalit Children in India. *Economic and Political Weekly* volume 31 (16-19) : 1011-1024, April 20-27, 1996. Nambissan, Geetha B. (2000) : 'Dealing with deprivation', Seminar, September, No. 493, pgs. 9. Nambissan, Geetha B. (2001) : 'Social Diversity and Regional Disparities in Schooling : A Study of Rural Rajasthan' in Vaidyanathan, A. and P.R. Gopinathan Nair (ed.) Elementary Education in Rural India : A Grassroots View, Sage Publications, New Delhi and Ramachandran, Vimala and Taramani Naorem. November 2013. What it means to be a Dalit or Tribal child in our schools : A synthesis of Six-State Qualitative Study. Economic and Political Weekly. Vol XLVIII No. 44, November 2, 2013

7 *Marie Lall and S Srinivasa Rao 2011 : Revisiting the equity debate in India and the UK : Caste, Race and Class Intersections in Education - in Marie Lall and Geetha B Nambissan : Education and Social Justice in the era of globalisation : Perspectives from India and the UK, Routledge, New Delhi, 2011. Page 34.*

'ইন্টারভিউ হল লুডোর ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু ---তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।'

ইন্টারভিউ : WBCS-2015তেই হোক স্বপ্নপূরণ

প্রিলি, মেনসের বাধা অতিক্রম করে আজ আপনারা সাফল্যের চৌকাঠে দন্ডায়মান। আর একটি বাধা অতিক্রম করতে পারলেই সার্থক হবে নিজের স্বপ্ন। এটিকে 'বাধা' বলা যায় না, বরং 'সুযোগ' বলা যেতে পারে। ডব্লুবিসিএস-এ ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ জীবনে বার বার আসবে না। আর তা কাম্যও নয়। সুতরাং এ সুযোগ অপচয় না করে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা একান্ত জরুরি। আপনার সচেতনতা ও বিচক্ষণতা এবং আমাদের গাইডেন্স আপনার বহুকাঙ্খিত স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

ইন্টারভিউয়ে একচান্সে সাফল্যলাভের জন্য আপনাকে জানতে হবে কতকগুলি HOWs এবং WHATs এর উত্তর

- কিভাবে ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতাকে অতিক্রম করবেন।
- কিভাবে পদগুলিকে পছন্দের ক্রমে সাজাবেন।
- কিভাবে আপনি কলেজ ছাড়ার পরের অলস বছরগুলিকে account for করবেন।
- কিভাবে বোর্ড সদস্যদের সাথে eye-contact বজায় রাখবেন।
- কিভাবে এককথায় গুছিয়ে উত্তর দেবেন।
- কিভাবে অপশনালের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলিকে আন্দাজ করবেন।
- কিভাবে আপনি ইন্টারভিউয়ের সময় 'নিজের মধ্যে' থাকবেন।
- কিভাবে আপনার soft skill গড়ে তুলবেন।
- কিভাবে, কোন ভাষায় সদস্যদের সম্বোধন করবেন।
- কিভাবে বোর্ড সদস্যদের বাধ্য করবেন আপনাকে সিলেক্ট করতে।
- কিভাবে আপনার হবি এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীকে WBCS কাজের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করবেন।
- কিভাবে রাজনীতি সংক্রান্ত বিতর্কিত প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যাবেন।
- কিভাবে ready made hobby তৈরি করবেন (যদি না থাকে)।

ইন্টারভিউ ব্যাচের ভর্তি চলছে।

আবার জয় জয়াকার

২৩শে ডিসেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হল মিসলেনিয়াস-২০১২ এর। অন্যান্য বারের মতো এবারও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের জয়জয়কার। ৬৫ জন ইন্টারভিউ পরীক্ষার্থীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে ৫৫ জনেরও বেশি প্রার্থী। সাফল্যের হার আকাশছোঁয়া। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল---এরা সকলেই ছিল WBCS প্রিলি ও মেনস্-এর ব্যাচে ভর্তি চলছে। অ্যাসপিরান্ট, সাফল্য এসেছে WBCS এর প্রস্তুতিতেই। সুতরাং আবারও প্রমাণিত হল লক্ষ্য যদি হয় WBCS, কিছু একটা চাকরি অবশ্যই অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

MISC-2012 : সাফল্যের হার 85%

সাফল্যের জন্য দরকার শুধু তীব্র ফোকাস, লড়াই করার জেদ এবং হার না মানা মানসিকতা। বাকিটা সময়ের এবং আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

'মিশন গ্রুপ-C/D বই'

'WBCS-SCANNER' বইটির অভাবনীয় সাফল্যের পর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশ করতে চলেছে ক্লার্ক, রেল, পুলিশ এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বই। বইটি লিখেছেন সুতপা কর, সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। বইটিতে পাচ্ছেন—

☑ প্রতিটি বিষয়ের কমনযোগ্য স্টাডিম্যাট। ☑ প্রচুর সমাধানসহ অঙ্ক। ☑ বিগত বছরের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন-উত্তর। ☑ ও.এম.আর শীট সহ মডেল মক টেস্ট। ☑ ২০১৫ সালের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্। ☑ ২য় পত্রের অসংখ্য নমুনা রিপোর্ট, প্রেসি, সারাংশ, অনুবাদ (E to B & B to E)।

বইটি প্রকাশিত হবে ২২শে জানুয়ারি, ২০১৬

FREE workshop on WBCS INTERVIEW

WBCS ইন্টারভিউয়ের ওপর একটি ফ্রি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে কলেজ স্কোয়ারে। যোগদান করতে পারেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যোগদান করার জন্য ঠিকানা-সহ নিজের নাম নিম্নলিখিতভাবে SMS করুন **9038786000** নম্বরে : P.Tworkshop_(Name)_

WBCSইন্টারভিউ স্ট্র্যাটেজি

বিভিন্ন দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশ করতে চলেছে ইন্টারভিউয়ের সাত-সতেরো নিয়ে এক অনবদ্য বই। এতে আছে—

● বিগত বছরে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন ১৫০০+ প্রশ্ন। ● CTO/ACTO, BDO/Jt. BDO এবং DSP কে প্রথম চয়েস দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি। ● দ্য লাস্ট হার্ডল। ● প্রশ্ন আসে কোথা থেকে। ● কি করবেন/কি করবেন না। ● ড্রেস কোড।

... এবং আরো অনেক কিছু যা ইন্টারভিউতে আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে।

বইটি প্রকাশিত হবে ২৯শে জানুয়ারি, ২০১৬

যে কোন মঙ্গল, শনি ও রবিবার চলে আসুন—

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

9038786000
9674478644

Website: www.academicassociation.in . Centre: Uluberia-9051392240 . Birati-9674447451 . Darjeeling-9832041123 . Berharampur-9775333007

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা স্থাপিত ব্রিটিশ মডেলকেই বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে। শিক্ষাদানের পরম্পরাগত পদ্ধতি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের রমরমার যুগে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের হালহকিকত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন—**ড. হিমাংশু ঘোষ।**

মানব উন্নয়ন সূচকের তিনটি নির্দেশকের মধ্যে একটি হল শিক্ষা।[১] এই 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' ফলে উচ্চশিক্ষা যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা কোনও অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে সময়ে ঋষিরা উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করত। এগুলি 'আশ্রম' বা 'গুরুকুল' নামে অভিহিত হত। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এ ধরনের একটি অন্যতম কেন্দ্র। এখানে ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও ভাস্কর্য, চিকিৎসাবিদ্যা, সমরবিদ্যা, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অনুরূপ বৌদ্ধযুগে বহু উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী, কাঞ্চি প্রভৃতি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই সব কেন্দ্রে চীন, তিব্বত, জাভা প্রভৃতি দেশ হতে শিক্ষার্থীরা আসত। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। শাসক রাজা-মহারাজারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খরচ বহন করত।

দ্বাদশ শতকে ভারতে ইসলামিক শাসকদের আধিপত্য কায়েম হয়। তারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, লখনউ, আজমির প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই কেন্দ্রগুলিতে ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আইন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান হত। অ্যাডামের বিবরণ থেকে জানা যায় যে হিন্দুদের 'টোল' এবং মুসলমানদের 'মাদ্রাসা' ছিল উচ্চশিক্ষার মূল কেন্দ্র।

পরবর্তীকালে দুশো বছরের মতো আমরা ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকায় ভারতে ব্রিটিশ মডেলের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গুরুগৃহ-পাঠশালা-মক্তব-মাদ্রাসা-তক্ষশীলা-নালন্দা-বল্লভী মডেল একে একে বাতিল হয়ে যায়। উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রসারে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে এবং তা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া ১৮৮৭ সালে স্থাপিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৬ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ভারতীয় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে মিশনারিদের উদ্যোগ ছাড়া রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও-র ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান। কমিশন ১৯৪৯ সালে তার রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষক, শিক্ষার মাধ্যম, নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ অনুসরণে ১৯৫৬ সালে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। আজও কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থার মাধ্যমেই উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে।[২]

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখার জন্য রাধাকৃষ্ণান কমিশনের সুপারিশ মতো ১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন মূলত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বললেও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করে। ১৯৬৪ সালে ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করতে ডি.এস. কোঠারীর নেতৃত্বে আরও একটি কমিশন গঠিত হয় যা ১৯৬৬ সালে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে উন্নতির জন্য মূল্যবান সুপারিশ করে। এছাড়া ২০০৬ সালে জাতীয় মেধা কমিশনও তার সুপারিশ হাজির করে।

মূলত উপরে বর্ণিত কমিশনসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পর জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮, ১৯৭৯, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯২ সালে সংশোধিত হয়[৩] এবং তদনুসারে আমাদের উচ্চশিক্ষা পরিচালিত হয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষার সংস্কার সাধনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যার মধ্যে কিছু প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে এবং কিছু প্রস্তাব আইন হবার জন্য অপেক্ষমাণ।[৪] এগুলি হল:

(১) এডুকেশনাল ট্রাইবুন্যালস বিল, ২০১০

(২) দি ইউনিভারসিটিজ ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বিল, ২০১২

(৩) দি ফরেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস (রেগুলেশন অব এন্ট্রি অ্যান্ড অপারেশনস) বিল, ২০১০

(৪) হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বিল, ২০১১

(৫) দি ন্যাশনাল এক্রিডিটেশন রেগুলেটরি অথরিটি ফর হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস বিল, ২০১০

(৬) প্রহিবিশন অব আনফেয়ার প্রাকটিস ইন টেকনিক্যাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস, মেডিক্যাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ইউনিভারসিটিজ বিল, ২০১০

(৭) ন্যাশনাল একাডেমিক ডিপোজিটরি বিল, ২০১১

(৮) অ্যামেন্ডমেন্ট টু দি আরকিটেক্টস অ্যাক্ট, ১৯৭২

(৯) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২

(১০) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইআইটি) বিল, ২০১৩।

উপরোক্ত শিক্ষানীতি ও প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে ভারতে উচ্চশিক্ষা বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান সারণি-১-এ তুলে ধরা হল।

স্বাধীনতার সময়কালে ভারতে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ০.২ মিলিয়ন, ১৯৬০-৬১ সালেও তা ১ মিলিয়নে পৌঁছাতে পারেনি। ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা ২০১১-১২ সালে ১৫.৮ মিলিয়নে পৌঁছায় এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ঘোষিত পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে আগামী ২০২১-২২ সালে এই সংখ্যা ৩২ মিলিয়ন হবে।[৬] ইউনেস্কো পরিবেশিত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিশ্বে উচ্চশিক্ষার গড় ছাত্রসংখ্যা হল ২৮.৭ শতাংশ এবং ভারতে তা হল ১৬.২ শতাংশ।[৭]

পশ্চিমবঙ্গে নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র না থাকলেও ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় এখানে উচ্চশিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে ওঠে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সারণি-২-এ বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি[৮] উচ্চশিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত।

উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যতীত উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।[৯] এগুলি হল—

১. টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১২ বেসরকারি

২. এডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪ বেসরকারি

৩. সিকম বিশ্ববিদ্যালয়, বীরভূম, ২০১৪, বেসরকারি

৪. ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, বেসরকারি

৫. এমিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, বেসরকারি

৬. জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, বেসরকারি

৭. নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, বেসরকারি

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি রাজ্য ও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি-১
ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার ছাত্রসংখ্যা[৫]

বছর	বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা	মহাবিদ্যালয় সংখ্যা	মোট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্রসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)
১৯৪৭-৪৮	২০	৪৯৬	৫১৬	০.২
১৯৫০-৫১	২৮	৫৭৮	৬০৬	০.২
১৯৬০-৬১	৪৫	১৮১৯	১৮৬৪	০.৬
১৯৭০-৭১	৯৩	৩২৭৭	৩৩৭০	২.০
১৯৮০-৮১	১২৩	৪৭৩৮	৪৮৬১	২.৮
১৯৯০-৯১	১৮৪	৫৭৪৮	৫৯৩২	৪.৪
২০০০-০১	২৬৬	১১১৪৬	১১৪১২	৮.৮
২০০৫-০৬	৩৪৮	১৭৬২৫	১৭৯৭৩	১০.৫
২০১১-১২	৫২৩	৩৩০২৩	৩৩৫৪৬	১৫.৮

সারণি-২
পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়	স্থাপনকাল	প্রকৃতি
১.	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা	১৮৫৭	রাজ্য
২.	বিশ্বভারতী, বোলপুর, বীরভূম	১৯৫১	কেন্দ্রীয়
৩.	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা	১৯৫৫	রাজ্য
৪.	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান	১৯৬০	রাজ্য
৫.	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া	১৯৬০	রাজ্য
৬.	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জোড়াসাঁকো, কলকাতা	১৯৬২	রাজ্য
৭.	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং	১৯৬২	রাজ্য
৮.	বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া	১৯৭৪	রাজ্য
৯.	বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর	১৯৮১	রাজ্য
১০.	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলকাতা	১৯৮১	রাজ্য
১১.	নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা	১৯৯৭	রাজ্য
১২.	পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সল্ট লেক, কলকাতা	২০০০	রাজ্য
১৩.	পশ্চিমবঙ্গ আইন বিশ্ববিদ্যালয়, সল্ট লেক, কলকাতা	২০০০	রাজ্য
১৪.	উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার	২০০১	রাজ্য
১৫.	পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা	২০০৩	রাজ্য
১৬.	বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর	২০০৪ ২০১০	রাজ্য কেন্দ্রীয়
১৭.	রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বেলুড়	২০০৫	ডিমড
১৮.	আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সল্ট লেক, কলকাতা	২০০৭	রাজ্য
১৯.	গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা	২০০৮	রাজ্য
২০.	পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত	২০০৮	রাজ্য
২১.	প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা	২০১০	রাজ্য
২২.	সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া	২০১০	রাজ্য
২৩.	কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, চুরুলিয়া, বর্ধমান	২০১২	রাজ্য
২৪.	কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার	২০১২	রাজ্য
২৫.	ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ডহারবার	২০১২	রাজ্য
২৬.	বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া	২০১৩	রাজ্য
২৭.	পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, শিক্ষাপরিকল্পনা ও প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা	২০১৫	রাজ্য

সারণি-৩
এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা—২০১২-১৩

বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	ডিগ্রি কলেজ	শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ	ল কলেজ	আর্ট কলেজ	ম্যানেজমেন্ট কলেজ	হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ	সংগীত কলেজ	প্রযুক্তি কলেজ	অন্যান্য	মোট
কলকাতা	৫৯	৬৯৮	১২৯	৩৪	৬	১	১	-	১	১	১	১৭৪
বর্ধমান	২৯	২২৭	৯৩	৩১	৬	১	-	-	১	-	১৩	১৪৫
বিদ্যাসাগর	১৯	১১৭	৪৪	২১	২	১	-	-	-	-	৬	৭৪
কল্যাণী	২২	২৪৫	৪৩	২১	৩	-	-	-	-	-	৩	৭০
উত্তরবঙ্গ	২২	১৪৮	৫০	১০	১	-	-	-	-	-	-	৬১
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয়	২৭	১৬১	৫০	১১	১	-	-	-	-	-	১	৬৩
গৌড়বঙ্গ	১৯	১০৬	২৪	১৩	-	-	-	-	-	-	-	৩৭
যাদবপুর	৩৫	৬৩৬	-	১	-	-	১	-	-	-	-	০২
রবীন্দ্রভারতী	২২	১৫৫	-	-	-	১	-	-	-	-	-	০১
সিধু-কানু-বিরসা	-	-	১৯	৪	৪	-	-	-	-	-	১	২৮
বেসু	১৬	২০৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নেতাজি সুভাষ মুক্ত	৫	১২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি	৭	৩২	-	-	-	-	৪০	৪	-	৮৪	৫৯	১৮৭
											সর্বমোট	৮৪২

দ্রষ্টব্য : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠদান হয়।

সারণি-৪
স্নাতক স্তরে (ইউ.জি.) পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী—২০১২-১৩[১১]

বিষয়	ছাত্র				ছাত্রী				সর্বমোট
	সাধারণ	এস.সি.	এস.টি.	মোট	সাধারণ	এস.সি.	এস.টি.	মোট	
মানবিক	৩১৭৬৭৬	৯৬৩৭৬	১৯২৩০	৪৩৩২৮২	৩৮০৫২৬	৬৫৪৯৯	১২৪২২	৪৫৮৪৪৭	৮৯১৭২৯
বিজ্ঞান	৮৩৭৯৬	১৬৮৯৫	২৮০০	১০৩৪৯১	৬৪২৯	৬৮৮২	১৩৯৪	১৪৭০৫	১১৮১৯৬
বাণিজ্য	৮৪১৮৮	৭৫৩৮	১১৯০	৯২৯১৬	৩৬৫৫	১২২৩	৪০২	৫২৮০	৯৮১৯৬
শিক্ষা	৪৬০৩	১০১৩	৩০৬	৫৯২২	৪৮৪	৭৮০	২২৯	১৪৯৩	৭৪১৫
আইন	৩৮৫১	৫২০	৫৮	৪৪২৯	৩৪৯	২৫৬	১৬	৬২১	৫০৫০
প্রযুক্তি	৬৮৬৯৮	৬০৯৩	৫২৬	৭৫৩১৭	২০৫৮২	১৪৪৯	১৩৯	২২১৭০	৯৭৪৮৭
পরিচালন	৫৬৯৯	২৬৬	৫৫	৬০২০	১৫৪২	৭৪	৩২	১৬৪৮	৭৬৮৮
অন্যান্য	২৩৪৭	২৭২	৭৭	২৬৯৬	২১৯	১৫৯	৪৫	৪২৩	৩১১৯
সর্বমোট									১২২৮৮৮০

এবং ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় বিল গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা অন্য রাজ্যের কাছে ঈর্ষণীয়। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (১৯৫৯), খড়্গপুরের আইআইটি (১৯৫১), জোকার আইআইএম (১৯৬১) অথবা রাজ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, আর কে মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, নেতাজি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ প্রমুখ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে নানাবিধ শিক্ষা লাভ করা যায়।

পরিশেষে, উচ্চশিক্ষার প্রথম ও প্রধান মাধ্যম মহাবিদ্যালয়গুলির কথা বলা যায়। একদা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও হিন্দু কলেজের (১৮১৯) হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে কলেজ শিক্ষার সূচনা হয় তা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানে পাঁচ শতাধিক ডিগ্রি কলেজে প্রায় ১২,২৮,৮৮০ জন ছাত্রছাত্রী পাঠরত। সারণি-৩, ৪ ও ৫-এ তা তুলে ধরা হল[১০]।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই রাজ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ৩০ বছরের

সারণি-৫
স্নাতকোত্তর স্তরে (পিজি) পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী—২০১২-১৩[১২]

বিষয়	ছাত্র				ছাত্রী				সর্বমোট
	সাধারণ	এসসি	এসটি	মোট	সাধারণ	এসসি	এসটি	মোট	
মানবিক	১৯২৮৪	৬৩২০	৯২৪	২৬৫২৮	২২৩৫২	৪৯৯৬	৫৪২	২৭৮৯০	৫৪৪১৮
বিজ্ঞান	১২০৭৯	২০৫৫	১৭৩	১৪৩০৭	৬৮৯৬	১৮৯৮	৮০	৮৮৭৪	২৩১৮১
বাণিজ্য	৩১৫৪	৪৭২	৩৩	৩৬৫৯	১৬৭৫	২৬৭	২১	১৯৬৩	৫৬২২
শিক্ষা	১১৬০	৪৩৬	৬৪	১৬৬০	১০৯৮	৪৪৭	২৫	১৫৭০	৩২৩০
আইন	১৯১	৬৪	২৬	২৮১	২২৮	৪৫	২৮	৩০১	৫৮২
প্রযুক্তি	৩১৫৭	৩৬৪	৪৯	৩৫৭০	৬০৭	৯৯	১০	৭১৭	৪২৮৭
পরিচালন	২৪৩৬	১২৫	১৪	২৫৭৫	৯৮১	৪০	১	১০৩৫	৩৬১০
অন্যান্য	৩৮৭৫	৫৭২	৬০	৪৫০৭	৫০৯২	৩১৭	৫১	৫৪৬০	৯৯৬৭
সর্বমোট									১০৪৮৯৭

দ্রষ্টব্য : ১. কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সরাসরি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত হিসাব।
২. কেন্দ্রশাসিত উচ্চশিক্ষা সংস্থার ছাত্র-ছাত্রী এ হিসাবে ধরা হয়নি।

শেষে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২৪১টি কলেজ গড়ে ওঠে। স্নাতকোত্তরে ৩৯০৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও স্নাতকস্তরে ৪১৪২৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রী পাঠ গ্রহণ করে।[১৩] পরবর্তী ৩৪ বছরে নতুন ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২১১টি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর স্তরে ৯৫০৯৭ জন এবং স্নাতকস্তরে ১০,৬৬,১৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পাঠগ্রহণ করেছে। বিগত ৪ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২২ থেকে ৩৪টিতে পর্যবসিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাও (সরকারি ও সরকার অনুমোদিত) বেশ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে (সর্বশেষ সংখ্যা ৫০১টি)। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শেষে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ১০৪৮৯৭ জন এবং ১২,২৮,৮৮০ জনে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বছরে দুবার নেট, গেট এবং বছরে একবার সেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য নতুন মাপকাঠি স্থির হয়েছে। তথাপি ভারতে শিক্ষার মান যথাযথ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সম্প্রতি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানী ভারতীয় সংসদে ঘোষণা করেছেন ২০১৬ সালে ২ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, ১০০০ ব্লক এবং অসংখ্য পৌরসভার সঙ্গে আলোচনা করে নতুন শিক্ষানীতি চালু করবেন।[১৪] আশাকরি অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমতুল উচ্চশিক্ষা ভারতে কায়েম হবে এবং বিশ্বের সেরা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি স্থান অন্তত দখল করবে।[১৫]❑

[লেখক ১৯৭২ সালে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে ২০০৪ পর্যন্ত অধ্যাপনায় ব্রতী থাকেন ও রিডার পদে উন্নীত হন। ২০০৪ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষাদান করেন এবং ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন।
email : himansughosh1947@gmail.com]

তথ্যসূত্র :
(১) U.N.D.P. : Human Development Report (2000), Oxford University Press, New Delhi, p. 147.
(২) India 2009 : A Reference Annual (2009), Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi, p. 237.
(৩) India 2015 : A Reference Annual (2015), Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, New Delhi, p. 258.
(৪) Ibid., p. 259.
(৫) Agarwal Pawan, Higher Education in India : The Need for Change (2013), I.C.R.I.E.R. Working Paper, 2013.
(৬) M.H.R.D., Selected Education Statistics, M.H.R.D., 2013, New Delhi.
(৭) UNESCO, Education for All—2015, Paris.
(৮) Wikipedia, Higher Education in India.
(৯) https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education_in_India
(১০) Government of West Bengal, Annual Report—2012-13, Department of Higher Education, Bikash Bhawan, Kolkata, p. 3.
(১১) Ibid., p. 7.
(১২) Ibid., p. 7.
(১৩) Government of West Bengal, Statistical Handbook, 1988, B.A.E.S. Kolkata, p. 66.
(১৪) Statesman, Kolkata Dated December 1, 2015.
(১৫) Thomson Reuters, World University Ranking, 2014-15, The Times Higher Education.

শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টি

পুষ্টির অভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষুন্ন হয় এ কথা বলা বাহুল্য। এর প্রতিফলন ঘটে শিক্ষা ক্ষেত্রেও। শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন **মিতালি পালধি।**

যে কোনও দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের মানুষের যথাযথ শিক্ষা। মানবসম্পদের উপযুক্ত বিকাশ, আর্থিক অগ্রগতি ও উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকাংশেই শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। একদিকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ও অন্যদিকে সূচক হিসাবেও শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘ যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন তাতে শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে ছেলে, মেয়ে নির্বিশেষে সার্বজনীন করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি শিশু যেন এর আওতায় আসে এবং পুরো পাঠক্রম সমাপ্ত করতে পারে। ভারত সরকারের এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের ২০০৫-০৬ সালে ভর্তির নিট হার (নেট এনরোলমেন্ট রেট বা NER) ছিল ৮৪.৫ শতাংশ, ২০১৩-১৪ সালে যা বেড়ে হয়েছে ৮৮.০৪ শতাংশ, অর্থাৎ NER বা প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া ভর্তি হওয়ার সংখ্যাটা বেড়েছে। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়াটা এক ব্যাপার আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আর এক ব্যাপার। আর সমস্যাটা ঠিক সেই জায়গায়। অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলে ভর্তি হলেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার হার বেশ হতাশাব্যঞ্জক এবং এই সমস্যা শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অনেক ব্যাপক। আমাদের দেশে 'স্কুলছুট'-দের সংখ্যাও বেশ উদ্বেগজনক (সারণি-১, ২)। সারণিতে দেওয়া তথ্য এই দিকনির্দেশ করছে যে প্রাথমিক স্তরে বা তার পরবর্তী পর্যায়ে পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা বা হার খুব নগণ্য নয়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা কিছুটা হলেও কম। শিক্ষার বিষয়টির সঙ্গে সামাজিক, আর্থিক, শারীরিক ও নানা বিষয় জড়িত।

বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে মানুষের পুষ্টির মান ও সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। একেবারে শৈশব থেকে শিশুর পুষ্টির ও স্বাস্থ্যের মানের সঙ্গে সঠিক শিক্ষার বিষয়টি আজ বিশ্বের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সঠিক পুষ্টির সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্রটি অতি নিবিড়। যথাযথ শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা, উন্নত জীবন যাত্রা বা দীর্ঘ জীবনের রহস্য পুরোপুরি বোঝা না গেলেও, এটা সত্যি যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক উন্নতি—এসবই পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলও বটে।

অর্থনীতির নিরিখে, বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে যা প্রত্যক্ষ করা যায় জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে। [২০১২-১৩ সালে = ৫.১ শতাংশ ২০১৩-১৪ সালে = ৬.৯ শতাংশ ২০১৪-১৫ সালে = ৭.৩ শতাংশ, সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫] তবে এই উন্নয়নের সুফল সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে ঠিকমতো পৌঁছানো যায়নি যা প্রত্যক্ষ করা যায়, মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টির মানের হিসাবে। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে অপুষ্টির হার বেশ উদ্বেগজনক, বিশেষত শিশু (১-৫ বছর পর্যন্ত) মহিলা ও কিশোরীদের মধ্যে। ভারতে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই অর্থাৎ ৪০ কোটিই শিশু। সারা পৃথিবীর সমস্ত শিশুকে ধরলে প্রতি ছটি শিশুর মধ্যে একটি ভারতের। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে (জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা)-র ২০০৫-০৬ সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতি দুটি শিশুর মধ্যে একটি অপুষ্টিতে আক্রান্ত। এমনকি, ৬-৩৫ মাস বয়সের ৭৯ শতাংশ শিশুই রক্তাল্পতা বা অ্যানেমিয়ার শিকার (সারণি-৩)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপুষ্টিগ্রস্ত শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশ ও আচরণগত সমস্যা তাদের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন মাতৃজঠরে থাকার সময় ও জন্মের পর যথাযথ পুষ্টি যেমন শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তেমনই মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশেরও সহায়ক হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের অপুষ্টি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশকে বিরূপভাব প্রভাবিত করে। এই সময়ে যথাযথ পুষ্টি ও যত্নের অভাবে "ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন"-এর মতো সমস্যা তৈরি হয় যা শিশুর দৈহিক ও মস্তিষ্কের সঠিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। এছাড়াও সন্তানসম্ভবা মায়ের শরীরে রক্তাল্পতা, আয়োডিন, ফোলিক অ্যাসিড, অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলস-এর অভাব, এসবই সার্বিকভাবে শিশুর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। শরীরে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব, অযত্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা এসবই শিশুর

সারণি-১
রাজ্যওয়াড়ি স্কুলছুটের পরিসংখ্যান ২০০৯-১০ সালে

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি
অন্ধ্রপ্রদেশ	১.৩	১.৪	২.০	০.৯	৯.০	১.৬	৩.২	—
আসাম	১.৭	১.১	১.২	৭.০	২.৪	১.৮	৫.৯	—
বিহার	২.৩	২.৩	২.৭	১.৯	৬.২	১.৬	১.৩	০.৫
ছত্তিশগড়	২.৮	১.৬	২.৭	২.৫	১৩.৭	৬.১	২.৪	১.৭
দিল্লি	০.৩	০.৩	০.৭	০.২	২১.৬	০.২	০.৫	০.২
গুজরাট	০.৪	০.৪	০.৪	২.৩	০.৫	০.৩	৭.৫	—
হরিয়ানা	০.৮	০.৬	০.৮	০.৭	৬.৫	০.৩	০.১	০.২
হিমাচলপ্রদেশ	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫	৫.০	২.২	০.৩	০.২
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৭	০.৮	০.৪	০.২	৪.৫	০.৮	০.৪	০.৩
ঝাড়খণ্ড	২.৫	২.১	২.১	১.৮	৬.৫	২.৭	৩.০	২.৭
কর্ণাটক	১.০	১.২	০.৮	১.১	৩.৫	১.৭	৯.৬	—
কেরালা	০.১	০.০	০.০	১৫.৫	০.১	০.১	১০.৫	—
মধ্যপ্রদেশ	২.৩	১.৫	১.৫	০.৯	৭.৯	২.২	১.৭	২.৫
মহারাষ্ট্র	১.৭	০.৭	০.৪	৪.৯	০.২	০.২	৩.৯	—
ওড়িশা	০.৫	০.৪	০.৫	০.৫	৫.০	১.৫	৮.৩	—
পাঞ্জাব	৩.২	২.৩	২.৬	২.৬	৯.০	১.৭	২.২	০.৫
রাজস্থান	২.৬	২.২	২.১	২.৫	৬.৬	২.৫	২.২	২.০
তামিলনাড়ু	০.৬	০.৪	০.৬	০.৪	৬.০	২.৩	১.৬	১.৮
উত্তরপ্রদেশ	১.৫	১.৯	১.৫	১.০	১৮.১	১.৫	১.৭	১.২
উত্তরাখণ্ড	১.০	১.১	০.৯	১.০	৪.৫	১.০	১.০	০.৪
পশ্চিমবঙ্গ	১.৫	১.১	০.৮	৬.৯	০.১	০.৪	০.৪	০.২
সব রাজ্য	**১.৬**	**১.৪**	**১.৪**	**২.১**	**১০.১**	**১.৬**	**৩.৩**	**১.৩**

সূত্র : Final Report, Survey for Assessment of Dropout Rates at Elementary Level in 21 States. Jan. 2013. SSA.

শিক্ষার্জন প্রক্রিয়ার ওপর নানা ভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রকৃতপক্ষে শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারটা অনেকটাই নির্ভর করে তার বৌদ্ধিক বিকাশ, অঙ্গসঞ্চালন এবং সামাজিক ও ভাবগত উন্নতির ওপর। দেখা যায়, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরেও নানা অসুখ, যেমন ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, রক্তাল্পতা, নিমোনিয়া, কৃমি সংক্রমণ এসবই তার স্কুলে উপস্থিতি ও পঠন-পাঠনকে প্রভাবিত করে। অপুষ্টির কারণেও এদের নানা ধরনের আচরণগত সমস্যাও তৈরি হয়।

সাধারণত যে সব শিশু পুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগে তাদের শরীরে ঘন ঘন নানা বিপাকজনিত পরিবর্তন ঘটে (মেটাবলিক চেঞ্জ) যা তাদের বৌদ্ধিক বিষয় ও মস্তিষ্কের কাজকর্মকে ব্যাহত করে। এছাড়াও রক্তে কম গ্লুকোজ বা কম শর্করার মাত্রাও তাদের মস্তিষ্কের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটায়। সঙ্গে অ্যানিমিয়া রক্তাল্পতাও তাদের পড়াশোনায় মনঃসংযোগে অসুবিধা সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই খালি পেটে অনেকটা পথ হেঁটে স্কুলে আসে এবং দীর্ঘক্ষণ খালিপেটে থাকে, যা তাদের স্কুলের পড়াশুনার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

অনেক সময় দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে আক্রান্ত স্টান্টেড (কম উচ্চতার) বা ওয়েস্টেড (খুব রোগা) ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠাতেও চান না। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপ্রয়োজনীয় খরচের (ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট) ভয় অপরদিকে বৌদ্ধিক বিকাশ কম হওয়ার ও আচরণের সমস্যা থাকার জন্য এই সব শিশুদের পরীক্ষার ফল ভালো না হওয়ার কারণে (সারণি ৪)।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সঠিক মানসিক বিকাশ না হওয়ার জন্য (সিভিয়ার মেন্টাল রিটার্ডেশন) বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৫ জন, জামাইকাতে প্রতি হাজারে ১৭ জন ও পাকিস্তানে প্রতি হাজারে ১৯ জন শিশু স্কুলে যেতে পারছে না। [(Durkin 2002) Early Child hood health & education, Mathew Juke, P. No. 16]। UNICEF-এর একটি প্রতিবেদনে (Multi Sectoral Approaches to Nutrition) বলা হয়েছে বিশ্বের ৭৯টি দেশে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব শিশুর শারীরিক উচ্চতা (দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির শিকার) স্বাভাবিকের তুলনায় কম তাদের সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে সমস্যা হয়। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে কম উচ্চতার

সারণি-২
স্কুলছুটের হার ২০০৯-২০১০

	১-৫ম শ্রেণি			১-৮ম শ্রেণি			১-১০ম শ্রেণি		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
২০০৯-১০	৩১.৮	২৮.৫	৩০.৩	৪১.১	৪৪.২	৪২.৫	৫৩.৩	৫১.৮	৫২.৭
২০১০-১১	২৯.০	২৫.৪	২৭.৪	৪০.৬	৪১.২	৪০.৮	৫০.২	৪৭.৭	৪৯.২
২০১১-১২	২৩.৪	২১.০	২২.৩	৪১.৫	৪০.০	৪০.৮	৪৮.৬	৫২.২	৫০.৩
২০১২-১৩ (P)	২৩.০	১৯.৪	২১.৩	৪১.৮	৩৫.৭	৩৯.০	৫০.৪	৫০.৩	৫০.৪
২০১৩-১৪ (P)	২১.২	১৮.৩	১৯.৮	৩৯.২	৩২.৯	৩৬.৩	৪৮.১	৪৬.৭	৪৭.৪

সূত্র : Educational Statistics at a glance.

সারণি-৩
জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০০৫-০৬)

৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (বয়সের তুলনায় কম ওজন। যা সামগ্রিকভাবে দীর্ঘকালীন বা তীব্র অপুষ্টি নির্দেশ করে। কম ওজন সাধারণত সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মানের সূচক)	৪৩ শতাংশ
বয়সের তুলনায় খুব রোগা (যা তীব্র অপুষ্টির নির্দেশক)	২০ শতাংশ
বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে ভোগার সূচক। দীর্ঘদিন খেতে না পাওয়া, দারিদ্র ইত্যাদির কারণে)	৪৮ শতাংশ
৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সি শিশুর অ্যানেমিয়া	৭৯ শতাংশ

সারণি-৪

ICDS-এর উদ্দেশ্য	পরিষেবা
— ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু, সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানের উন্নতি ঘটানো — শিশুদের যথাযথ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি তৈরি করা — অসুস্থতা, মৃত্যুহার, অপুষ্টি ও স্কুলছুটের হার কমানো — শিশুর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগের নীতি ও কার্য রূপায়ণের মধ্যে সমন্বয় আনা — পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে মায়েদের সচেতন করে তোলা যাতে তারা শিশুদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে পারেন।	● পরিপূরক আহার ● প্রথা বহির্ভূত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ● প্রতিষেধক ● স্বাস্থ্য পরীক্ষা ● প্রয়োজনে Referral services ● পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

সারণি-৫
পুষ্টি ও শিক্ষাচক্র (UNICEF)

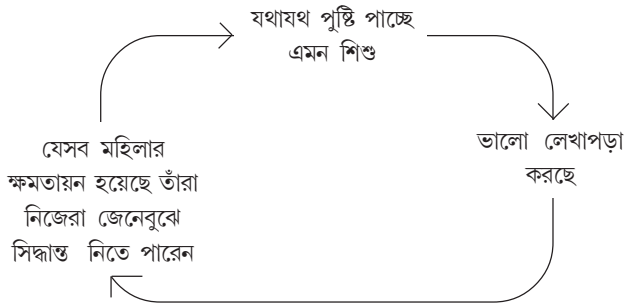

শিশুর সংখ্যা ১০ শতাংশ বাড়লে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে এমন শিশুদের সংখ্যা ৮ শতাংশ হ্রাস পায় (সারণি ৫)।

UNICEF-এর আর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভারতে 'স্কুলছুট'দের সংখ্যা খুবই উদ্বেগজনক। প্রায় ৮ কোটি পড়ুয়া তাদের প্রাথমিক শিক্ষার পুরো মেয়াদ শেষ করতে পারে না। আবার ৮০ লক্ষ পড়ুয়া কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলছুট হয়ে যায়। এবং শহরের তুলনায় গ্রামে এই সমস্যাটা অনেক বেশি। এবং যেসব পড়ুয়া অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার আগেই স্কুলছুট হয় ধরে নেওয়া যায় তারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে সক্ষম নয়।

এছাড়াও অনুপুষ্টি বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস -বিশেষত আয়োডিন, আয়রন, ভিটামিন বি$_{১২}$ শরীরে এসবের অভাবও বৌদ্ধিক ক্ষতি করে যা অপরিবর্তনীয়। দেখা গেছে শুধুমাত্র আয়োডিনের অভাবের কারণে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় ১৩.৫ পয়েন্ট পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে, যা শিশুর শিক্ষার বিষয়টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ২০১৩ সালের Lancet series-এর মা ও শিশু সম্বন্ধীয় একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 'আর্লি চাউল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের সঙ্গে পুষ্টির বিষয়টি যুক্ত করলে, শিশুদের শারীরিক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ মানসিক বিকাশও হয় এবং শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রভাবও পড়ে।

শিশু ও মায়েদের অপুষ্টি প্রতিরোধে ও বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের অপুষ্টির হার কমানোর উদ্দেশ্যে ভারতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুটি প্রকল্প চলছে। একটি হল ICDS বা সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প যা জন্মের পর থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুদের জন্য ও তার সঙ্গে সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মায়েদের ও কিশোরী কন্যাদের জন্য। অপরটি হল মিড ডে মিল বা স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার দেওয়া। পুষ্টি সংক্রান্ত নানা সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় শিশুদের একটা বিরাট অংশই অপুষ্টি ও অপুষ্টি সংক্রান্ত নানা অসুখে আক্রান্ত হয়। এবং এর কারণগুলি যেমন বহুমুখী তেমনই বহুমাত্রিক। তাদের দৈনন্দিন খাদ্যে ৩০০-৫০০ কিলো ক্যালরি ও ১২-১৫ গ্রাম প্রোটিন ও নানা অনুপুষ্টি উপাদানেরও ঘাটতি থাকে। বিশেষত আর্থ-সামাজিকভাবে অনুন্নত শ্রেণির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তবে, শুধুমাত্র শিশুরাই নয় কিশোরী কন্যা, সন্তানসম্ভবা মহিলা ও প্রসূতি মহিলারাও একই ভাবে অপুষ্টির শিকার হয়, পরবর্তী পর্যায়ে যা তাদের সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। অপুষ্টি প্রতিরোধে ও শিশুর সর্বাঙ্গীণ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ICDS-এ নানা পরিষেবা দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালের ২ অক্টোবর এই প্রকল্পটি শুরু হয়, সারা দেশে ৩৩টি ব্লকে। বর্তমানে সারাদেশব্যাপী এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে এটা বলা যায়, এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত থেকে উন্নততর মানব-সম্পদ গড়ে তোলা যা দেশের উন্নতি ও বিকাশের সহায়ক হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যে

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে (২০০৯) ICDS-এর দৈনিক মাথাপিছু দেয় পুষ্টির মাত্রা		
বয়স	ক্যালরি	প্রোটিন
শিশুর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত	৫০০	১২-১৫ গ্রাম
অপুষ্টিগ্রস্ত শিশু ৬ বছর বয়স পর্যন্ত	৮০০	২০-২৫ গ্রাম
সন্তানসম্ভবা/প্রসূতি মা, কিশোরী	৬০০	১৮-২০ গ্রাম

সারণি-৬
মিড ডে মিলের পরিপূরক আহারের পুষ্টিমূল্য

পুষ্টিগুণ	প্রাথমিক ক্লাসে	উচ্চ প্রাথমিক ক্লাসে
ক্যালরি	৪৫০ কিলো ক্যালরি	৭০০ কিলো ক্যালরি
প্রোটিন	১২ গ্রাম	২০ গ্রাম
অনুপুষ্টি উপাদান	পর্যাপ্ত মাত্রায় অনুপুষ্টি	উপাদান যেমন লৌহ, ফোলিক অ্যাসিড জিঙ্ক, ভিটামিন এ ইত্যাদি।

সমাজের দুর্বলতর অংশ অর্থাৎ শিশু ও মহিলা ও কিশোরীদের এর আওতায় আনা হয়েছে।

ICDS-এ যেসব পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুষ্টিকর পরিপূরক আহার দেওয়া যাতে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অপুষ্টি, অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার হ্রাস করা যায়। সন্তানসম্ভবা মায়েদের অসুস্থতা ও মৃত্যুহার কমানো (MMR), এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রসূতি মায়েদেরও পরিপূরক আহার দেওয়া। এর সঙ্গে কিশোরী কন্যাদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে সুস্থ মা হতে পারে, অর্থাৎ একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করা। যা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ICDS-এর বেশ কয়েকটি কর্মসূচি রাষ্ট্রসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে (MDG) পৌঁছতে সাহায্য করবে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে—

- শিশুদের মধ্যে মাঝারি ও গুরুতর ধরনের অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা (MDG-1)
- IMR, CMR ও MMR-এর হার কমানো (MDG 4, 5) প্রভৃতি।

ICDS-এর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুর শারীরিক ও মানসিক এমন একটা ভিত্তি গড়ে তোলা যাতে শিশুদের স্কুলে ভর্তি ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার হার বাড়ানো যায় এবং স্কুলছুটের হার কমানো যায়।

সত্যিকথা বলতে একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য আই.সি.ডি.এস-এর বিশাল বড় ভূমিকা রয়েছে। আন্তঃপ্রজন্মোত্তর অপুষ্টি প্রতিরোধেও এর পরিষেবাগুলি অত্যন্ত আবশ্যক। সন্তানসম্ভবা মহিলা, প্রসূতি ও কিশোরীদের পরিপূরক আহার ও পুষ্টি শিক্ষার বিষয়টি যেমন কার্যকরী তেমনই শিশুদের ক্ষেত্রে পরিপূরক আহারের পাশাপাশি এক আনন্দময় পরিবেশে প্রথা বহির্ভূত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাটাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মিড ডে মিল নিয়ে আলোচনার পরিসরে আই.সি.ডি.এস সংক্রান্ত এসব তথ্য মনে রাখলে আমাদের কিছুটা সুবিধা হতে পারে। আই.সি.ডি.এস-এর পরিষেবার সুবাদে আমরা যে সুবিধাজনক অবস্থাটা তৈরি করি, তার সুফল সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে মিড ডে মিল-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় ধরে রাখা ও পরিপূরক পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য তাদের দিকে সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক।

মিড ডে মিল বা মধ্যাহ্নকালীন আহার

বিদ্যালয়ে শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধে, শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও স্কুলছুট কমানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় শুরু করা হয় ন্যাশনাল প্রোগ্র্যাম অফ নিউট্রিশনাল সাপোর্ট টু প্রাইমারি এডুকেশন (NP-NSPE) বা মিড ডে মিল প্রকল্প। শুরুতে দেশের ২৪০৮টি ব্লকের স্কুলগুলিতে চালু করা হয় এই প্রকল্প, পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদ সারা দেশের সমস্ত ব্লকের স্কুলগুলিকে এর আওতায় আনা হয়। সারা বিশ্বে স্কুলের ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর পরিপূরক আহার জোগানোর লক্ষ্যে এটি বৃহত্তম প্রকল্প। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল ও সুনিশ্চিত শিক্ষা প্রকল্প (EGS) অলটারনেটিভ ও ইনোভেটিভ এডুকেশন (AIE) প্রকল্পের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) রান্না করা খাবার দেওয়া শুরু হয়। যে খাবারের পুষ্টিমূল্য ছিল ৩০০ কিলোক্যালরি

সারণি-৭
স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন খাবারের পুষ্টিমূল্য

ক্রমিক সংখ্যা	বিভিন্ন খাদ্যবস্তু	প্রাথমিক বিভাগে			উচ্চ প্রাথমিক বিভাগে		
		মিড ডে মিল-এর জন্য প্রয়োজনীয়	ক্যালরি বা এনার্জির মাত্রা	প্রোটিন	মিড ডে মিল মিলের জন্য	ক্যালরি বা এনার্জি	প্রোটিন
১.	খাদ্য শস্য চাল, গম	১০০ গ্রাম	৩৪০ কিলো ক্যালরি	৮ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৫১০ কিলো ক্যালরি	১৪ গ্রাম
২.	ডাল	২০ গ্রাম	৭০ কিলো ক্যালরি	৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	১০৫ কিলো ক্যালরি	৬.৬ গ্রাম
৩.	সবজি	৫০ গ্রাম	২৫ কিলো ক্যালরি	—	৭৫ গ্রাম	৩৭ কিলো ক্যালরি	—
৪.	তেল	৫ গ্রাম	৪৫ কিলো ক্যালরি	—	৭.৫ গ্রাম	৬৮ কিলো ক্যালরি	—
৫.	লবণ ও মশলা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪৮০ কিলো ক্যালরি	১৩ গ্রাম	—	৭২০ কিলো ক্যালরি	২০.৬ গ্রাম

ও ৮-১২ গ্রাম প্রোটিন/প্রতিদিন। ২০০৬ সালের জুনমাস থেকে আবার পরিপূরক আহার ব্যবস্থায় কিছু বদল আনা হয় এবং খাবারের পুষ্টিমূল্য পরিবর্তন করে দৈনিক ৪৫০ কিলো ক্যালরি ও ১২ গ্রাম প্রোটিনের জোগান সুনিশ্চিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৭ সালের অক্টোবরে উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)-এর আওতায় আনা হয়। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ৩৪৭৯টি ব্লকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ১.৭ কোটি প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে যুক্ত করা হয় এই প্রকল্পে। ২০১৪-১৫ সালের মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৪-১৫ সালে ১১.৫৬ লক্ষ স্কুলের ১০.২২ কোটি পড়ুয়া এই মধ্যাহ্নকালীন গরম পরিপূরক খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

এই প্রকল্পের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এর সূত্রপাত ১৯২৫ সালে তদানীন্তন মাদ্রাজ অধুনা চেন্নাইতে। শুরুতে মাদ্রাজ পৌর এলাকায় আর্থ সামাজিকভাবে দুর্বল শিশুদের জন্য শুরু করা হয়েছিল এই প্রকল্প। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৮ সালে কলকাতার কেশব একাডেমিতে শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের দ্বিপ্রাহরিক জলখাবার দেওয়ার ব্যাপারটি। ১৯৪১ সালে কেরালাতেও স্কুলে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা শুরু হয়। ২০০২-২০০৪ সাল থেকে অধিকাংশ রাজ্যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে দ্বিপ্রাহরিক আহার দেওয়া শুরু করা হয়। বর্তমানে ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিশু যারা প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে তাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে এই পরিপূরক খাবার দেওয়া হয়ে থাকে।

মিড ডে মিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বা ভাবনা

- স্কুলে শিশুদের দ্বিপ্রহরে গরম খাবার পরিবেশন করা যাতে তাদের 'ক্ষুধা' নিবৃত্ত হয়।
- শিশুর পুষ্টির মান উন্নত করা।
- আর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসা, যাতে তার পঠন-পাঠনে আরও মনোযোগী হতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে স্কুলে যাতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত হয়, স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়ে ও স্কুলছুটও বন্ধ হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটি অনেকটা সুনিশ্চিত হলেও সামাজিক উন্নয়নের নানা মাপকাঠিতে এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছি আমরা।

মিড ডে মিল প্রকল্পটির বহুমুখী ও বহুমাত্রিক দিকগুলি ও এর উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, একদিকে এতে যেমন খাদ্য সুরক্ষা, পরিপূরক পুষ্টির ব্যাপার সুনিশ্চিত করা হয়েছে, অপরদিকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া বা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকেও সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুরা স্কুলে পড়াশোনা করার পরিবর্তে পরিবারের জন্য রোজগার করতে অনেকটা বাধ্যই হয়, অর্থাৎ তাদের কাছে রুটি-রুজির ব্যাপারটা বা খাবার জোগাড় করার বিষয়টা লেখাপড়ার তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্রের এই দুষ্ট চক্র ভাঙতে, শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই, কারণ শিক্ষার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে উন্নত মানের জীবনযাত্রা, সঠিক পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য এসবই, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে প্রত্যক্ষভাবে দেশের উন্নতির সহায়ক হয়।

মিড ডে মিল-এ যে রান্না করা খাবার দেওয়া হয় তা কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী তৈরি করা হয়ে থাকে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এই খাবার তৈরি করতে হবে এবং মাঝে মাঝে এই গরম রান্না করা খাবার কোনও সরকারি খাদ্য পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে এর গুণমান পরীক্ষা করতে হবে, খাবারের পুষ্টির মানের যথার্থতা যাচাই করার জন্য।

মিড ডে মিল-এর খাবার যাতে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে বা পরিচ্ছন্ন ও ঢাকা জায়গায় রান্না করা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৪-১৫ সালে ৭.৩৩ (উৎস : কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন) লক্ষ রান্নাঘর ও ভাঁড়ার রাখার জায়গায় তৈরি করা হয়েছে কারণ পাকা রান্নাঘর ও ভাঁড়ার না থাকার কারণে খোলা জায়গায় রান্না করা ও খাদ্যে বিষক্রিয়া হওয়ার মতো বহু ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে বিহারে মিড ডে মিল-এর খাবার খেয়ে বিষক্রিয়ায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা আজও আমাদের স্মৃতিতে রয়েছে।

মিড ডে মিলের যথার্থতা নিয়ে বেশ কিছু সমীক্ষা হয়েছে। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেনের প্রতীচি ট্রাস্ট (২০১০)-এর প্রতিবেদনে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা হল সারা দেশেই মিড ডে মিল সফল ভাবেই চলছে, যদিও তাঁরা বলেছেন যে খাবারের গুণমান আরও উন্নত করা দরকার এবং ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন। প্রোব-এর (পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন) করা গৃহ সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ৮৪ শতাংশ বাড়িতে বলেছে যে তাদের বাড়ির বাচ্চারা স্কুলে রান্না করা খাবার খায় এবং নানা ধরনের খাবারের পদ তারা উপভোগও করে। মিড ডে মিলের দরুন স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুলে পড়ুয়ারা খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্য বিধিও অনুসরণ করছে।

মধ্যপ্রদেশে NIPCCD কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক কো-অপারেশন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সমীক্ষার রিপোর্ট আরও বিস্তৃতভাবে জানিয়েছে যে মিড ডে মিল-এর জন্য প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শুধু সংখ্যাই নয়, স্কুলে তাদের উপস্থিতি, পুরো সময় ক্লাসে থাকার বিষয়টির যেমন প্রভূত উন্নতি হয়েছে, তেমনি স্কুলছুটের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে বিশেষত মেয়েদের মধ্যে। পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও জানিয়েছেন যে 'মধ্যাহ্নকালীন আহার' স্কুলে দেওয়ার জন্য তাদের পরিবারের কিছু আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে স্কুলের খাবারটি হল 'পরিপূরক আহার' যা সারাদিনের পুষ্টির চাহিদার ১/৩ অংশ মেটাতে সক্ষম, পুষ্টির সারাদিনের পুরো চাহিদা মেটাতে পারে না এই খাবার সুতরাং এই শিশুদের

বাড়ির বরাদ্দ খাবার কমিয়ে দিলে বা বন্ধ করে দিলে পুনরায় শিশুর অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। NIPCCD-এর সমীক্ষায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক জানা গেছে, সেটি হল, মিড ডে মিল দেওয়ার ফলে পড়ুয়ারা ক্লাসের পড়াশুনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের পড়াশোনারও উন্নতিও হচ্ছে। এবং এর ফলে সামাজিক সমদর্শিতার ব্যাপারটি তৈরি হচ্ছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যেখানে জাতপাতের বিচার এখনও রয়েছে।

রাজ্যওয়াড়ি একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন সেন্টার অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি। তাদের ২০১১ সালে ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশে করা সমীক্ষায় দেখা গেছে ওড়িশাতে মিড ডে মিলের অবস্থা, উত্তরপ্রদেশের (বুন্দেলখণ্ড) তুলনায় অনেকটাই সন্তোষজনক। ওড়িশাতে যেখানে ৮৬.৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই খাবার (নিয়মিত, কিন্তু পরিমাণে ও গুণগতভাবে উন্নতমানের নয়) পাচ্ছে সেখানে উত্তরপ্রদেশে ৫১.৮ শতাংশ পড়ুয়ারা মিড ডে মিলের খাবার খাচ্ছে (এখানেও নিয়মিত কিন্তু পরিমাণে কম ও গুণগতমান ভালো নয়)।

যোজনা কমিশনের (অধুনা নীতি আয়োগ) কর্মসূচি মূল্যায়ন সংস্থা ২০১০ সালের সমীক্ষাতে দেখিয়েছেন যে মিড ডে মিলে দেওয়া খাবার, 'ক্লাসরুম হাংগার' বা ক্লাসে ক্ষুধার্ত অবস্থায় লেখাপড়া করার (যা তাদের পড়াশোনায় মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায়) ব্যাপারটি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে. সামাজিক সাম্য বিধানে এর অবদানের দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, অনুন্নত বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান বা অনগ্রসর শ্রেণি থেকে আসা ছাত্র একসঙ্গে একযোগে একই খাবার খাচ্ছে। অবশ্য মাঝে মাঝে আমরা সংবাদপত্রে এর উলটো পরিস্থিতির খবর পেয়ে থাকি, তবে সেটা ব্যতিক্রমই।

যোজনা কমিশনের প্রতিবেদনে আরও একটি তথ্য উঠে এসেছে যা হল মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে শিক্ষকদের ব্যস্ততা বা তৎপরতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যুৎসাহের দরুন পড়াশোনার বিষয়টি কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হচ্ছে। মিড ডে মিলের খাবার আরও পুষ্টিকর করার জন্য বিশেষত অনুপুষ্টি উপাদান এতে আরও বৃদ্ধি করার জন্য ঝাড়খণ্ড অতি অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছে, সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি টাটকা শাকসবজি চাষ করে ICDS অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ও স্কুলগুলিতে জোগান দিচ্ছে। এতে একদিকে যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির রোজগার সুনিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে শিশুদের খাবারে বিটাক্যারোটিন (যা শরীরে ভিটামিন এ-তে পরিবর্তিত হয়), লৌহ, ভিটামিন সি-র জোগান বাড়ছে। এই পন্থা সারা দেশে অবলম্বন করা গেলে অনুপুষ্টির অভাব অনেকটাই কমানো সম্ভব হতো। ঝাড়খণ্ডের স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়াদেরও যুক্ত করা হয়েছে। বালসংসদের মাধ্যমে তারা প্রতিদিনের খাবার দেওয়া, খাবারের গুণমান বজায় রাখা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এসব দিকে যেমন লক্ষ রাখে তেমনই খাবার আগে হাত ধোওয়া, খাবারের বাসনপত্র ধুয়ে পরিস্কার ভাবে রাখা। খাবার দেবার সময় প্রতিটি শিশুকে সারিবদ্ধ ভাবে বসানো এবং সরস্বতী বাহিনীর (যারা খাবার পরিবেশন করেন) কাজে সহায়তা করে থাকে। বালসংসদ সদস্যদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে যে তারা খাবারের উপকরণগুলি যেমন পরীক্ষা করে দেখে তেমনই বজ্য পদার্থগুলিকে নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করে। পুরো ব্যাপারটিই নিঃসন্দেহে সাধু এবং অনুসরণযোগ্য উদ্যোগ। যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পুরো প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করাটা যেমন নিশ্চিত হয় তেমনই তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও নিজেদের অধিকার রক্ষার বিষয়টিও সুনিশ্চিত হয়। সত্যি বলতে কি এই 'ঝাড়খণ্ড মডেল'টি প্রতিটি রাজ্যে অনুসরণ করা হলে, মিড ডে মিল নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ অনেকটাই পরিহার করা সম্ভবপর হতো।

যোজনা কমিশনের প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়েছে মিড ডে মিলের জন্য সারা দেশেই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়লেও নতুন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা সেরকম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি।

তবে শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোই নয় এর মাধ্যমে প্রতিটি পড়ুয়াকে পুষ্টি শিক্ষা দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন কারণ সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টি ও সুষম আহার, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ধ্যানধারণা তৈরি করে দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। পৃথিবীর বহুদেশের স্কুলে শিশুকে খাবার দেওয়ার সময় সেই খাবারের নানা উপাদান ও শিশুর শরীর গঠনে সেসব উপাদানের ভূমিকা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে শিশুর মধ্যে সঠিক খাদ্যাভ্যাস যেমন গড়ে ওঠে তেমনই প্রতিটি খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সে অবহিত হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যাঁরা মিড ডে মিলের রান্না করেন তাঁদের, বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে রান্না করা ও পরিস্রুত পানীর জলের গুরুত্ব এসব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক সময়েই শিশু স্কুলে খাবার পাচ্ছে বলে বাড়ির খাবার থেকে বঞ্চিত হয়, যা তার পুষ্টির জোগানকে ব্যাহত করে। সারাদেশে ৩৩ শতাংশ শিশু বাড়িতে সপ্তাহে প্রতিদিন দুধ পায়, ২২ শতাংশ সপ্তাহে কোনও কোনও দিন দুধ খায়, ৫ শতাংশ শিশু বছরে বা মাসে কখনও কখনও দুধ খেতে পায় আর প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু দুধই পায় না। এবং এই না পাওয়ার দলে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ (৭৫ শতাংশ), বিহার (৫৬ শতাংশ), কর্ণাটক (৭১ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (৬৬ শতাংশ) [উৎস : 'পারফর্মেন্স, ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অফ মিড ডে মিল প্রোগ্যাম, প্রকল্প মূল্যায়ন সংস্থা, যোজনা কমিশন, ২০১০]। ওই একই সংস্থা শিশুদের ডাল খাওয়া নিয়ে যে সমীক্ষা করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ৪৫ শতাংশ শিশু প্রতিদিন বাড়িতে ডাল খায়, ৪৯ শতাংশ সপ্তাহে কখনও কখনও খায়, সাড়ে ৩ শতাংশ মাসে বা বছরে কখনও কখনও খায়, প্রায় ২ শতাংশ শিশু কখনওই বাড়িতে ডাল খেতে পায় না। ঠিক একই অবস্থা ফলের ব্যাপারে, সারাদেশে মাত্র ১৩ শতাংশ শিশু রোজ ফল খেতে পারে; ৮.৬৫ শতাংশ সপ্তাহে কখনও কখনও ফল খায়। ৬০ শতাংশ খায় মাসে বা বছরে কখনও কখনও আর ১৮.৬৫ শতাংশ শিশু কখনওই পায় না। এই পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে ডাল বা

দুধের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, যা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ও রোগ প্রতিরোধের জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা থেকে বহু শিশু বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন মরশুমি ফল যেগুলি ভিটামিন সি, এ, ও অন্যান্য অনুপুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ তার থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে শিশুর পুষ্টির মানের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ওপরের আলোচনায় কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। যে উন্নততর পুষ্টি উপাদান, পড়াশোনা ও স্বাস্থ্যের মান দুটিকেই উন্নত করে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান ও পুষ্টির পরিণতি (নিউট্রিশনাল আউটকাম) পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। ক্ষুধা প্রশমনে ব্যবস্থা পুষ্টির মানকে উন্নত করে এবং সুস্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটায়। তাই পুষ্টির উন্নততর মান, উন্নত জ্ঞান ও অধ্যয়নকে সম্ভব করে তোলে। দেখা গেছে, কিশোরী মেয়েদের শরীরে ম্যাক্রো ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের অভাবের পরিণাম ভবিষ্যতে তার শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আর শিশুর জীবনের প্রারম্ভে অপুষ্টিজনিত সমস্যা তার স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এবং শিশুকে এই ক্ষতির পরিণাম সারা জীবন বয়ে চলতে হয়। ফলে পরবর্তী জীবনে শিক্ষা অর্জনের জন্য ও উৎপাদনশীল ও উপার্জ্জনক্ষম হয়ে ওঠার জন্য নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষমতা তাদের হ্রাস পায় তাই শিশুর অপুষ্টির সমস্যা শুধু তার শৈশবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রভাবিত করে তার সমস্ত জীবনকে। তিন বছরের কমবয়সি অপুষ্টিগ্রস্ত একটি শিশু একটি অপুষ্টি গ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবেই বেড়ে ওঠে এবং মানুষ হিসাবে তার সম্ভাবনাকে বুঝে উঠতে ও কাজে লাগাতে পারে না। অপুষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধারই একটি সূচক হিসাবেই ধরা হয়।

এই পরিস্থিতিতেই ICDS-এর মতো কর্মসূচি ভারতে শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাস্থল অর্থাৎ ICDS-এর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই শিশুর শিক্ষার ভিতটি তৈরি হয়ে যায় যা পরবর্তী পর্যায়ে স্কুল শিক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে। ICDS ও মিড ডে মিল দুটি কর্মসূচিতে শিশুকে ও স্কুলের ছাত্রীদের অতিরিক্ত পরিপূরক আহার দেওয়া হয় তাদের স্বাস্থ্যের ও পুষ্টির মান ঠিক রাখার জন্য। উদ্যোগটি সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, প্রথম কথা যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অতি অপ্রতুল ফলে একই ধরনের খাবার প্রতিদিন দেওয়া হয়। স্বাদ বদলের সুযোগ নেই বললেই চলে। প্রতিটি শিশুর মাথাপিছু চাল, ডাল এসব বরাদ্দ করা হয়েছে তার গুণগত মান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো নয় এবং রান্না করার পর মাথাপিছু ওই খাবারের পরিমাণ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা বেশ মুশকিল। তাই যে সব পাত্র দিয়ে পরিবেশন করা হয়, তা যেন সমমানের করা হয়, শুধুমাত্র পুষ্টিকর পরিপূরক আহার জোগান দেওয়াই নয়। মাঝে মাঝেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিউট্রিশান অ্যাসেসমেন্ট বা পুষ্টির মান ও স্বাস্থ্যের মান পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং তার বিশদ নথি বা রেকর্ড রাখা দরকার। মাসে ১ দিন একটি বিশেষ মিটিং ডেকে ছাত্রছাত্রীদের মায়েদেরও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন কারণ শিশুরা স্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে মায়ের হেফাজতেই থাকে ও খায়।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কমিশনারগণ ২০১০-১১ সালে আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেছেন যে মিড ডে মিল-এর ব্যাপারটি পুষ্টি শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বা পাঠক্রম সেভাবে তৈরি করতে হবে। NCERT ইতিমধ্যেই তাদের বেশ কিছু পাঠক্রম তৈরি করেছে। স্কুলে যাঁরা মিড ডে মিলের রান্না করছেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও একান্ত দরকার। তাদের কোনও ছোঁয়াচে অসুখ বিসুখ আছে কি না জানা দরকার। যাতে তাঁরা অসুস্থতা যেমন সর্দি, জ্বর, কনজাংটিভাইটিস, ডিসেন্ট্রি, ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া এসব হলে রান্নার সঙ্গে যুক্ত না হন।

স্থানীয় মানুষজনকে এর সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি আরও জোরদার করতে হবে যাতে তাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। যদিও ২০১৪-১৫ সালের আর্থিক বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার মিড ডে মিলের বহু স্কুলেই রান্নাঘর তৈরি করেছেন। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। রান্নাঘরের কাছাকাছি কিচেন গার্ডেন করা গেলে সারা বছর ব্যাপী মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ শাকসবজির জোগান পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ড সরকারের মতো স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এগুলির যত্ন ও দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিতেও পারে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক ভাবে হাত ধোয়া, বিশেষভাবে খাওয়ার আগে ও পরে। বাসনপত্র ধোয়া, আয়োডিনযুক্ত লবণ খোলা না রাখা বা শাকসবজি কাটার আগেই ধোয়া, ঢাকা দিয়ে রান্না করা, পরিস্রুত পানীয় জল ব্যবহার করা এসবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। মনে রাখা দরকার যত পুষ্টিকর খাবারই দেওয়া হোক না কেন তা যদি নিরাপদ না হয় তবে পুষ্টি সঠিকভাবে শরীরের কাজে লাগে না। তবে শুধু মাত্র পরিপূরক আহারই নয় নিয়মিত ডিওর্য়ামিং বা কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টশনের মতো কর্মসূচীগুলি চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সক্রিয় সহযোগীতা ও অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। খাবারের সঠিক গুণগত মান মাঝে মাঝেই কোনও সরকারি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন। তবে মিড ডে মিল নিয়ে শিক্ষকদের অতি সক্রিয়তা ও ছাত্রছাত্রীদের অত্যুৎসাহ যেন এই কর্মসূচির যে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ভালোভাবে পড়াশোনা করা ও করানো তার থেকে আমাদের বিচ্যুত না করে। ❑

[লেখক পুষ্টিবিদ ও ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট।]

প্রথম ভাষা চর্চা : কিছু ভাবনা, কিছু সংশয়

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া, বিশেষত 'প্রথম' ভাষার ওপর। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ধরে নেওয়া হয় যে মাতৃভাষাই শিশুর প্রথম ভাষা। কিন্তু বাস্তবে সব সময় তা হয় না। ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ রাজ্যে এই সমস্যা কীভাবে প্রভাব ফেলছে বিশ্লেষণ করছেন **ঋত্বিক মল্লিক।**

২০১৫ সালের জুন মাস নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় অভিযোগ ওঠে যে শিক্ষাদপ্তর প্রকাশিত তৃতীয় শ্রেণির প্রথম ভাষা বাংলা বইয়ে (পাতাবাহার) বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে একটি হল যে, 'পৃথিবীতে একসময় গাছেরা চলাফেরা করতে পারত। শিকড় মাটির নীচে চালাচালি করে তারা ঘুরে বেড়াত। মানুষ চাইলে তাদের জিনিসপত্র গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কাজও করত এই সব গাছেরা।' কিন্তু মানুষ এমন অত্যাচার শুরু করল যে গাছেরা অভিমানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সেদিন থেকে গাছেরা আর চলাফেরা করে না। এখন প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে এটি একটি উপকথা বা প্রচলিত গল্প। এরকম বহু উপকথা—রূপকথা—প্রচলিত গল্পকথা আমাদের রাজ্যে যেমন, তেমনি সারা পৃথিবীর জল-হাওয়াতেও ঘুরে বেড়ায়। এই প্রচলিত গল্পগুলি সংগ্রহ করেছেন অনেক মানুষ। শিশুকালে যখন লিখতে-পড়তে পারে না, তখন যৌথ পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণত এই ধরনের গল্প বলে থাকেন। তাই শিশুদের পরিচিত গল্পের জগৎ বলতে প্রধানত প্রচলিত এই গল্পগুলিকেই বোঝায়।

আবার সমস্যাটাও এখানেই। একদিকে শিশুর এই গল্পকথার জগৎ, অন্যদিকে বিজ্ঞান। পাঠ্যবই তৈরি করার ক্ষেত্রে কী হবে এর মাপকাঠি? বিজ্ঞানের কথা বলে কি তাহলে আমরা বাদ দেব শিশুর শোনা এই গল্পগুলো? এখনও যে শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্বভারতীয় দলিলটি পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, তা হল 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক বা এনসিএফ) ২০০৫' বা এই রূপরেখায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে তার পরিচিত জগৎ থেকে নিয়ে যেতে অপরিচয়ের দিকে, 'নোন টু আননোন', 'লোকাল টু গ্লোবাল'-ই হবে সেই যাত্রাপথের মানচিত্র। প্রাক্-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বর্ণচেনা, যুক্তবর্ণ চেনা, শব্দ তৈরি থেকে বাক্যগঠন ইত্যাদি সিঁড়ি ভেঙে যখন সে প্রবেশ করল ভাষার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-কবিতার জগতে, তখন সে-বয়সে তার চেনা গল্পের জগৎ হল প্রচলিত রূপকথা-উপকথা আর চেনা কবিতার জগৎ হল প্রচলিত নানা ধরনের ছড়া। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণিতে প্রথম ভাষার কোনও বই তৈরি করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে এই 'চেনা জগতের গল্পগুলি'-র কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত 'পাতাবাহার, তৃতীয় শ্রেণি'-র বইটিও তাই কোনও ব্যতিক্রম নয়।

যদি খেয়াল করেন, দেখবেন, এই ধরনের গল্পে কথা বলছে সিংহের সঙ্গে ইঁদুর, সারসের সঙ্গে শিয়াল, শিয়ালের সঙ্গে কুমির, কচ্ছপের সঙ্গে খরগোশ, পিঁপড়ের সঙ্গে মৌমাছি ইত্যাদি। আমরা সবাই ছোটবেলায় এই গল্পগুলো শুনেছি ও পড়েছি, কিন্তু তখন মনে হয়নি যে এই ব্যাপারগুলো বৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক। ছোটবেলার গল্পে রাজপুত্র-রাজকন্যা, পরি, রাক্ষসের যে মেলা, সেগুলোকে বিজ্ঞান অনুমোদন দেয় কি না তা কিন্তু আমরা ভাবিনি, বরং বিজ্ঞানকে কলা দেখিয়ে বেশ একটা কল্পনার জগৎ আমাদের মনে তৈরি হত, যেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত স্কুলের কঠিন-নীরস-ক্লান্তিকর বইগুলোর চাপে।

আসলে আমরা ভুলে যাই যে এই গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে যে বইয়ে (এক্ষেত্রে 'পাতাবাহার'), সেটি পড়বে সাত/আট বছরের ছেলেমেয়েরা। যাঁরা পড়াচ্ছেন বা যাঁরা বিধানসভায় যাওয়ার ছাড়পত্র পাচ্ছেন, তাঁদের জন্য নয়। তাঁদের বিজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে এই বিষয়টিকে দেখলে গণ্ডগোল লাগা স্বাভাবিক।

ফিরে যাই ওই গল্পটির কথায়, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। গল্পটির নাম 'গাছেরা কেন চলাফেরা করে না'। গল্পটি আসলে গাছের প্রতি মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদটি রূপকের আড়ালে থাকলেও গাছেদের যে যত্ন করা উচিত, গাছের উপর অত্যাচার করা উচিত নয়,—এই বার্তাটুকু বুঝে নিতে শিসু মনেরও কোনও অসুবিধে হয় না। আসলে প্রচলিত গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল তার মধ্যে থেকে যায় কোন-না-কোন নীতি বা আদর্শ। কচ্ছপ-খরগোশের গল্পই হোক, নীলবর্ণ শিয়ালই হোক বা সিংহ-ইঁদুরের গল্পেই হোক—নীতি কথা একটা থাকেই। গল্পের শেষে সেই নীতি কথাটাই বড় হয়ে ধরা দেয়। তখন শিশু মনে এই প্রশ্নটা জাগে না যে কী করে সিংহের সঙ্গে ইঁদুরের কথা হবে? বরং শিশুরা চমৎকৃত হয়ে ওঠে যে ছোট্ট ইঁদুরও কেমনভাবে সিংহকে বাঁচায় এই ভেবে। তাই শিশু বয়স থেকে চরিত্র গঠনের কথা মাথায় রাখলে এই ধরনের গল্পের নির্বাচন আবশ্যিক হয়ে যায়।

এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে শুধু আমাদের দেশে বা রাজ্যের জলহাওয়াতেই

তথাকথিত 'অবৈজ্ঞানিক' গল্পগুলি ঘুরে বেড়ায়, বরং যেসব দেশ প্রযুক্তিতে উন্নত, যাঁদের 'নকল' করে আমাদের এই বিজ্ঞান বলে আর্তনাদ, সেসব দেশে প্রচলিত গল্প নিয়ে চর্চা আরও প্রাচীন। সেসব দেশের প্রাইমার ভরে আছে এই ধরনের গল্পে।

আবার ধরুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প 'তোতাকাহিনী', যে গল্পটিকে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা প্রায়ই টেনে আনি, সেখানে যা ঘটছে, এই যে তোতাপাখিকে লেখাপড়া শেখানোর আয়োজন তা কি 'বিজ্ঞানসম্মত'? কিন্তু এই গল্পটি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় সব স্তরেই পাঠ্য ছিল বা আছে। কিন্তু এই নিয়ে বিধানসভায় কোনও অভিযোগ নেই। বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতক স্তরে বা স্নাতকোত্তর স্তরে এমন অনেক বই পাঠ্য যেখানে তথাকথিত 'বিজ্ঞান' বহুক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়েছে। তা হলে সব ছেড়ে এই বিশেষ শ্রেণির বইটি অভিযুক্ত হল কেন? বিধায়কের মনে হয়েছে এমন অবৈজ্ঞানিক ধারণা শিশু-কিশোরদের দেওয়া হলে তাদের মনের বিকাশ কেমন করে হবে। অর্থাৎ তুলনায় বয়সে বড়দের তাহলে 'অবৈজ্ঞানিক ধারণা' দেওয়া হলে অসুবিধে নেই, কিন্তু অল্প-বয়সে তা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অথচ কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন বয়স্ক লোকেরাই; ধর্ম নিয়ে, ধর্মীয় আচার নিয়ে অসহিষ্ণুতা আছে বড়দের মধ্যেই। সেখানে বিজ্ঞান কোথায় গেল, কে জানে?

আসলে বিজ্ঞানকে এতদূর ভুল পথে নিয়ে এসেছি, যে একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যবইকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে এই গল্পগুলির জগৎ। অথচ অন্যদিকে নতুন করে মানুষ ভাবছেন এই রূপকথা—উপকথাগুলিকে; এই গল্পের ফর্ম-ভাষা আর ম্যাজিককে ব্যবহার করে আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-গল্প রচিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক সংসদ প্রথম ভাষার (বাংলা) বইয়ে পাঠ্য করেছে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'বিরাট ডানাওলা এক থুথুরে বুড়ো' গল্পটি। গল্পের নাম থেকেই তো মনে হতে পারে যে কী ভীষণ অবৈজ্ঞানিক কথা! কিন্তু এ নিয়ে কোনও সভাতেই কেউ অভিযোগ করবে না। কারণ একে তো গার্সিয়া মার্কেজ মানুষের মনে জায়গা করে বসে আছেন, তাই আবার নোবেল পুরস্কার জয়ী, সাদারা মানে ইউরোপ স্বীকৃতি দিয়েছে; সুতরাং তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। বেচারা আমাদের এই গ্রামবাংলার প্রচলিত গল্পগুলির তো এমন রক্ষাকবজ নেই, তাই যে-কেউ অভিযোগ করতে পারে।

দুই

'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে বলেছিলেন যে, প্রাথমিক স্তরের একেবারে গোড়ায় বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। যে-সব শব্দ শিশুরা শোনে, সেগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেই অনেকটা কাজ হয়। পরিচয় করানোর দরকার আলাদা করে পড়ে না, মানুষ তার সহজাত ক্ষমতা দিয়েই বহু শব্দ চিনে নেয় এবং ব্যবহার করে। এখন এই গোটা শব্দ থেকে বর্ণ চেনানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে বাংলা-বর্ণক্রম সেক্ষেত্রে কিছুটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যাটি হল, ধরুন 'যদি' আর 'নদী' এই শব্দের ই-ধ্বনিটি শুনতে একরকম। অথচ বর্ণ চেনানোর সময় 'যদি'-র ই-ধ্বনি আর 'নদী'-র ঈ-ধ্বনির তফাত বোঝানো যাবে কী করে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে-পথের হদিশ দিয়েছেন, সে-পথ ধরে কতদিন চলবে শিশুরা? এখন নিয়ম অনুসারে সরকারি বা সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর বয়সে শুরু হয় প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণি। সেখানে, অন্তত আমাদের রাজ্যে, বর্ণ চেনানোর আয়োজন করা হয়নি, রাখা হয়েছে রামানন্দ-নির্দেশিত পথেই। কিন্তু ছ-বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে শুরু হয় বর্ণ চেনা। বেসরকারি স্কুলে অবশ্য এরকম কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। দু-বছর থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রথম ভাষা (বাংলা) আর দ্বিতীয় ভাষার (ইংরেজি) বর্ণ চেনানোর প্রক্রিয়া। জনমানসে বেসরকারি স্কুলগুলির এই 'এগিয়ে থাকা' সরকারি স্কুলের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। কিন্তু এই বিতর্কে প্রবেশ করা আমার লক্ষ্য নয়, আমি বলতে চাইছি যে 'ই'-ধ্বনি আর 'ঈ'-ধ্বনি ছয় বছর বয়সের একটি শিশুকে বোঝানো যায় কেমন করে? কানে এই দুই ধ্বনির মধ্যে কোনও পার্থক্য ধরা পড়ে না। সাধারণত বর্ণ চেনার জন্য পাঠ্যবইয়ে ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটি করে বস্তু আর তার ছবি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ঈ-ধ্বনি বোঝানোর যে বস্তু বা তার ছবি দেওয়া হোক না কেন, তা ই-ধ্বনির মতোই শুনতে লাগবে। একই সমস্যা হবে উ/ঊ-ধ্বনি, ঋ/রি-ধ্বনি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও।

'বর্ণবিশ্লেষণ' প্রাথমিক শ্রেণিগুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে অনুশীলনী অংশে প্রায়ই থাকে। শব্দগঠনের ক্ষেত্রে বর্ণগুলি কীভাবে থাকে, তা বোঝবার জন্য এই বর্ণবিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজনীয় একটা কাজ। সমস্যা হয়, অ-কারান্ত বা হসন্ত দিয়ে শব্দ শেষ হলে। অর্থাৎ ধরুন 'অন্ধকার' আর 'কাজ' শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ করলে শেষে অ-বর্ণটি থাকবে কি না! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, এক্ষেত্রে প্রায় নির্বিচারে শেষে 'অ' লেখা হয়। 'অন্ধকার'-এর বর্ণবিশ্লেষণে শেষে অ-বর্ণ থাকে (অ + ন্ + ধ্ + অ + ক্ + আ + র + আ), আবার 'কাজ' শব্দের শেষেও অ-বর্ণ দিয়ে দেওয়া হয়। আবার যদি আপনি এই দুই শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী করেন, তাহলে দুটির শেষেই 'অ' থাকবে না। কিন্তু আসলে 'অন্ধকার' শব্দটির শেষে নিশ্চিতভাবেই 'অ' আছে, তা না হলে আমরা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' (অন্ধকার + আচ্ছন্ন) শব্দটি পেতাম না। মাত্র ছয়/সাত/আট বছরের শিক্ষার্থীকে কীভাবে বোঝানো যাবে এর ভিতরের কথা!

এরকম নানা বিষয় ছড়িয়ে আছে স্কুলের ব্যাকরণ পাঠক্রমের মধ্যে। প্রথম এবং প্রধান বিতর্ক তো হল, আমরা বিদ্যালয়-স্তরে যে ব্যাকরণ পড়েছি বা এখনও পড়া হয় তা কি আদপেই 'বাংলা ব্যাকরণ' না কি 'সংস্কৃত ব্যাকরণ'-এর নিয়মে আধুনিক বাংলা ভাষাকে দেখার চেষ্টা! স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতনিষ্ঠা উনিশ ও বিশ শতকে চলে আসার পর এখনও তার জের চলছে। অথচ 'বাংলা ব্যাকরণ'-এর চিন্তাও শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই। বিভিন্ন সময়ে ভাষাতাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু স্কুলপাঠ্য

ব্যাকরণে তার প্রভাব পড়েনি। স্কুলপাঠ্য নয়, এমন বেশ কয়েকটি বাংলাভাষা-সংক্রান্ত বইয়ে বরং এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে 'অব্যয়' থাকবে কি না, 'সন্ধি' না 'ধ্বনি পরিবর্তন', বাংলাভাষায় কারক কটি আর কী কী, 'বাচ্য'-ই বা করকমের—এ ধরনের বিতর্ক জড়িয়ে রয়েছে প্রায় সবক্ষেত্রেই।

প্রথম ভাষা নিয়ে একটা চালু প্রথা হল, প্রাথমিক পর্যায়ে জোর দেওয়া হয় ভাষাশিক্ষার উপর এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে ভাষার সঙ্গে সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বটি মেনে নিয়েও বলা যায় যে, ভাষা-শেখার একেবারে গোড়ার দিকটা ছেড়ে দিলে, অর্থাৎ বর্ণ চেনা, যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে পরিচিতি—এই সময়টার পর ভাষা-শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কোন-না-কোন পাঠের। আর পাঠ যখন ব্যবহার করা হচ্ছেই, তখন এমন পাঠই নির্বাচন করা উচিত যেটা শিশুর পড়তে ভালো লাগে। ফলে প্রকারান্তরে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সাহিত্য একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েও হাত ধরাধরি করে চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই 'সহজপাঠ'-এর মতো সাহিত্যগুণসম্বলিত প্রাইমার লিখেছিলেন। কিন্তু ভাষাকে সাহিত্য থেকে আলাদা রাখার যুক্তিতে দীর্ঘদিন 'সহজপাঠ' অবহেলিত ছিল।

সমস্যা হয় অন্য জায়গায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা চালু অভ্যেস হল 'সিলেবাস শেষ করা'। ধরুন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির প্রথম ভাষার বইয়ে দশটি কবিতা ও দশটি গদ্য আছে। ওই শ্রেণির শিক্ষকের কাছে প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এক বছরের মধ্যে বইয়ের দশটি কবিতা ও গদ্য পড়িয়ে দিয়ে 'সিলেবাস শেষ' করা। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, এইভাবে 'সিলেবাস শেষ' হলেও শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ওই বিশেষ শ্রেণির কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য মানে পৌঁছতে পারেনি। দেখা যাবে যে পাঠক্রমের লক্ষ্য ছিল যে ওই বিশেষ শ্রেণির শেষে ছাত্রছাত্রীরা কোনও একটি পাঠ পড়তে পারবে এবং পড়ে বুঝতে পারবে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে দশটি বাক্য লিখতে পারবে যা যুক্তিনিষ্ঠ এবং যথাযথ। এখন এই সামর্থ্যে কেউ পৌঁছতেই পারে অনেক কমসংখ্যক পাঠ পড়ে। এবং এটি যদি ঘটে তাহলে বলা যেতে পারে যে তার ক্ষেত্রে 'সিলেবাস' শেষ হয়েছে। কিন্তু যদি বিপরীত ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ের সব গদ্য-কবিতা পড়ে ফেলল, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছল না, তাহলে বলতে হবে যে, সব পড়া হলেও 'সিলেবাস' শেষ হয়নি।

ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই সাহিত্যপাঠগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। সুতরাং কোনও একটি কবিতা বা গল্প সেই শ্রেণিতে পড়তেই হবে। এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনও সাহিত্যপাঠই ব্যবহার করা যায়, শুধু লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে-ভাষাগত দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং পাঠের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ দিক যেন গুরুত্ব পায়।

কিন্তু এর সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে এনসিএফ-২০০৫-এর নির্দেশ যে শিশুর সামনে যাই রাখা হোক, সেটা যেন তার পরিবেশের মধ্যে থাকে, একেবারে তার অভিজ্ঞতার বাইরের কোনও কিছু তার কাছে অপরিচয়ের ভার বাড়িয়ে দেয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যায় ১৯৪১ সালে প্রকাশিত প্রিয়রঞ্জন সেনের 'বাংলা পড়ানো' বইটি থেকে। 'এ' স্বরবর্ণটির সঙ্গে পরিচয় করানোর সূত্রে 'এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে'—বাক্যটি নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হল যে 'এক্কাগাড়ি' বাংলার সব শিশুর কাছে 'সর্ব্বজনবোধ্য' নয়। কোনও কোনও অঞ্চলে হয়ত 'এক্কাগাড়ি' শিশুর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকতে পারে। একইভাবে 'যানবাহন' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মেট্রো রেলের উদাহরণও এক্কাগাড়ির মতো 'সর্বজনবোধ্য' হবে না। পুরুলিয়া বা রাঢ় অঞ্চলের শিশুর অভিজ্ঞতার 'সমুদ্র' বা 'জাহাজ' কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিশুর কাছে 'তুষারপাত' এক অপরিচয়ের বার্তাই নিয়ে আসে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কারণে পাঠ্যবইয়ে পাঠ নির্বাচন এক দুরূহতম প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত প্রাথমিক স্তরে।

এই প্রক্রিয়া আরও বেশি জটিল হয়ে যায় যখন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মধ্যে আসে ভাষাবৈচিত্রের প্রসঙ্গ। আমরা যদি মেনেই নিই যে প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষার পাঠক্রম মানে তা মূলত ভাষাশিক্ষা, তাহলে তো প্রশ্ন ওঠে, সেটি কোনও ভাষা? প্রথম ভাষা না মাতৃভাষা?

আমাদের রাজ্যের একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা আর মাতৃভাষার মধ্যে কোনও ফারাক নেই। গঙ্গা নদীর নিম্নপ্রবাহের দুই তীরের হুগলি, কলকাতা, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনার ইত্যাদি অংশে ঘরের ভাষা আর স্কুলে পাঠ্য প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা বইয়ের ভাষা প্রায় একই। কিন্তু গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই একটা ঘটনা ঘটে না। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে বাংলার বিভিন্ন ভাষাবৈচিত্র, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষা ও তার ভাষাবৈচিত্র। এখন বাংলাভাষার নানা রূপের মধ্যে ওই গঙ্গা নদীর নিম্নপ্রবাহের দুই তীরের সমভূমি অঞ্চলের বাংলা 'মান্য চালিত বাংলা' হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু এই স্বীকৃতির কারণ কোনও ভাষাবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে শাসনক্ষমতা আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণেই এ অঞ্চলের বাংলাভাষার বৈচিত্রটি 'মান্য' বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে এ কথা বলাও দরকার যে বাংলার অন্যান্য ভৌগোলিক ভাষাবৈচিত্রের মতো এটিও একটি ভাষাবৈচিত্রমাত্র। এখন 'প্রথম ভাষা' বলতে যে 'মান্য বাংলা'-র ব্যবহার বইয়ে ঘটেছে তা এ রাজ্যের অন্যান্য ভাষাবৈচিত্রের শিশুদের কাছে 'মাতৃভাষা' বা 'ঘরের ভাষা' থেকে অনেকটাই আলাদা। এদের ক্ষেত্রে 'মাতৃভাষা' আর 'প্রথম ভাষা' এক নয়, আলাদা; এর ফলে 'প্রথম ভাষা' থেকেই অপরিচয়ের বাতাবরণের সূত্রপাত। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দিক থেকে কয়েকটি সমস্যার কথা উঠে আসে :

- prevents access to education, because of the linguistic, pedagogical and psychological barriers it creates
- may lead to the extinction of indigenous languages
- thus contributing to the disappearance of the world's

linguistic diversity

- often curtails the development of the children's capabilities, perpetuates poverty and causes serious mental harm. (Multilingual Education for Social Justice/A. Mohanty, M. Panda, R. Phikipson, T. Skutnably-Kangas/Orient BlackSwan.)

তাই শিক্ষা-দপ্তর প্রকাশিত পাঠ্যবইগুলির নেপালি, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু এবং সাঁওতালি ভাষায় (অলচিকি হরফে) অনুবাদ করা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে এই সব ভাষার 'প্রথম ভাষা'-র পাঠ্যবই, যেগুলি বাংলা পাঠ্যবইয়ের অনুবাদ নয়, এই সব ভাষার সাহিত্যভাণ্ডার থেকে সরাসরি পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, একটি ভাষার বই চাপিয়ে দেওয়া কমে আসছে আমাদের রাজ্য, বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে হয়ত আরও গভীর চিন্তার অবকাশ আছে। কত দূর পর্যন্ত এভাবে যাওয়া যেতে পারে? ভাষার রূপ তো বদলায় কিছু দূর অন্তরই, তাহলে কটি ভাষিক সংস্করণ করতে হবে তা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হবে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ থেকে প্রিয়রঞ্জন সেন, অনেকেই বিভিন্ন জেলার জন্য 'ভিন্ন ভিন্ন' আঞ্চলিক ভাষায় প্রাথমিক পাঠ্যবই রচনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সেন তো এতদূর বলেছিলেন যে, 'সমস্ত বাংলাদেশের পুস্তর এক ছাঁচে ঢালাই করিয়া লাভের চেয়ে ক্ষতিই করি বেশি'। যদি এঁদের কথা বাস্তবে প্রতিফলিতও হয়, তা হলেও সমস্যার সমাধান হবে বলে তো মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে দুটি দিকের কথা বলব। এক, 'ভাষিক দুষ্টচক্র' আর 'ভাষিক বাস্তুতন্ত্র'-এর কথা। আর দুই, বহুভাষিকতাচর্চার বিকল্প পথের কথা।

তাত্ত্বিকভাবে ভাষার সঙ্গে দারিদ্রের সম্পর্ক হয়তো অনেকেই মানতে চাইবেন না, কিন্তু সমীক্ষা বলছে, পৃথিবীর অধিকাংশ সংখ্যা ও বৈচিত্র আসলে দরিদ্রতম অংশে দেখা যায়—আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সমীক্ষার নির্যাস আমাদের দেশ এবং রাজ্য সম্পর্কেও সত্যি। ক্ষমতার

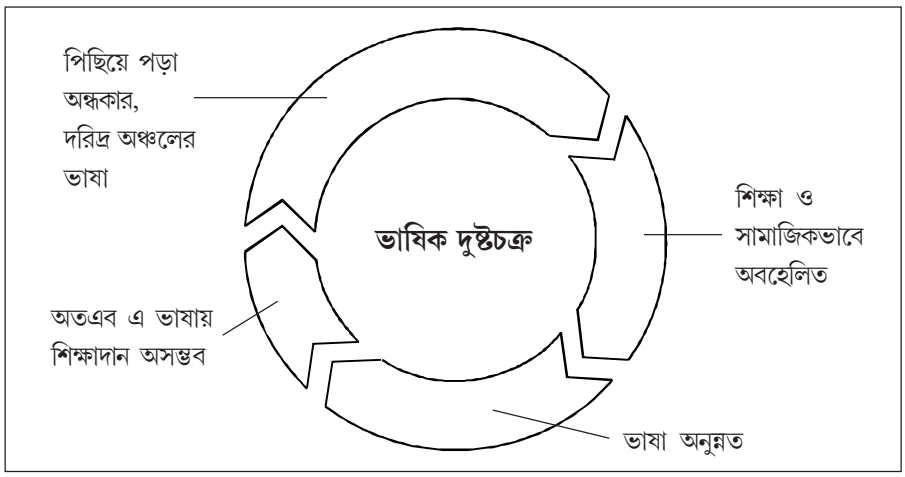

স্বীকৃতি বাস্তবে কোনও ছাপই ফেলে না। ক্ষমতার ভাষার সঙ্গেই তার আসল লড়াই। সাব-সারাহান আফ্রিকায় অন্তত তিরিশটি দেশের কথা বলা যায়, যেখানে কমবেশি ২৫০০ ভাষা প্রচলিত এবং এ অঞ্চলের প্রধান ভাষাটি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ভাষার থেকে আলাদা। মাত্র ১৩ শতাংশ শিশু তার নিজের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

এই দুষ্টচক্রে ঘুরতে ঘুরতে তাই হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ভাষা বা ভাষাবৈচিত্র। মনে হতে পারে যে সারা পৃথিবীতে একটামাত্র ভাষা থাকলেই বুঝি মিটে যায় এ সমস্যা। আর এ প্রসঙ্গেই আসে 'ভাষিক বাস্তুতন্ত্র' বা 'ল্যাংগুয়েজ ইকোসিস্টেম'-এর ধারণা। প্রকৃতিতে যেমন লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ বা প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং ক্রমাগত উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবলুপ্তি পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তেমনি ভাষার অবলুপ্তিও প্রভাব ফেলে ভাষিক পরিবেশে। কলিন বাসার লিখছেন, 'In the language of ecology, the strongest ecosystems are those that are the most diverse. That is, diversity is directly related to stability; variety is important for long-term survival. Our success on this planet has been due to an ability to adapt to different kinds of environment over thousands of years (atmospheric as well as cultural). Such ability is born out of diversity. Thus language and cultural diversity maximises chances of human success and adaptibility.

এই ভাষিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষার এবং দুষ্টচক্র ভাঙার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভাষা সচেতনতা (Language Awarness = LA)। LA বলতে কিন্তু অনেকগুলো ভাষা শেখা বোঝায় না, বরং সমাজে যত ভাষা দেখা যায়, সেগুলির ধরন ও কাজকে বুঝতে পারা বা বোঝার চেষ্টাকেই LA বলা যায়। যেসব দেশে এই ধরনের বিপুল ভাষাবৈচিত্র আছে, এবং যারা এই বৈচিত্রকে সম্পদের চোখে দেখে তাদের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় তার ছাপ ফেলেছেন, দেখা গেছে বহুক্ষেত্রেই তারা একেবারে প্রাথমিক স্তরে (অর্থাৎ প্রাক্-

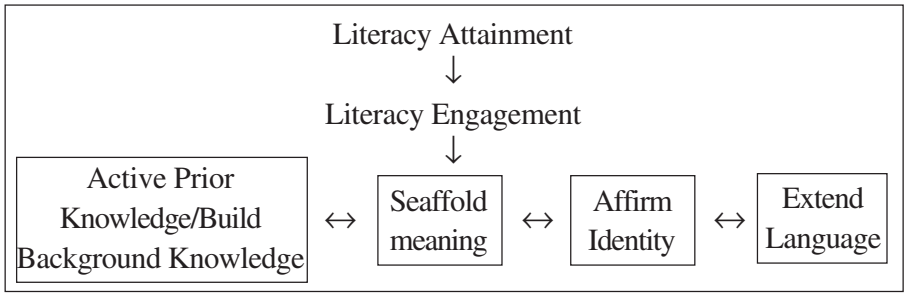

ভাষা থেকে দূরে প্রান্তে অবস্থিত এই ভাষাগুলি। শিক্ষার ভাষা হিসেবে মান্যভাষা গৃহীত বলে, সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নেও সে এগিয়ে এবং অন্যান্য ভাষাবৈচিত্রগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে। আবার শিক্ষা ও সম্মানের ভাষা নয় বলে মনে করা হয় যে এই ভাষাগুলি তুলনায় অনুন্নত, সুতরাং এ ভাষায় কোনও কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে তৈরি হয় এক ভাষিক দুষ্টচক্রের।

এই দুষ্টচক্র কিন্তু ঘুরে চলেছে বিভিন্ন পর্যায়ে। শুধু রাজ্যের সাপেক্ষে হয়তো বাংলা ক্ষমতার ভাষা, কিন্তু দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আবার বাংলাই হয়ে যেতে পারে দুর্বল ভাষার উদাহরণ। যাই হোক, এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক দেশেই একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় তার সংবিধানে, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এই প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত) ঘরের ভাষা বা নির্দিষ্ট ভাষার রূপকেই মান্যতা দেয়। পরবর্তী শ্রেণি থেকে পাশাপাশি চলতে থাকে প্রথমভাষা, ধীরে ধীরে মান্যতা পায়। এই প্রক্রিয়াটি চলে নীচের ছক অনুযায়ী।

ল্যাংগুয়েজ এনগেজমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে চারটি পরপর-সম্পর্কিত দিকের উপর। কোনও কিছু শেখার ক্ষেত্রে দেখে নেওয়া দরকার মাতৃভাষা আর L1 কীভাবে আছে। তারপর এই যাত্রাপথ ধরে চলবে এগিয়ে যাওয়া। এভাবেই ক্রমে চলে আসতে পারে L2, L3..., বাড়িয়ে নেওয়া যায় ভাষা-সক্ষমতার বৃত্তকে।

প্রথমভাষা চর্চা আসলে বহুভাষিকতার মধ্যে তৈরি করে এক সেতু, যেটি বিরাজ করে ঘর আর বিদ্যালয়ের মধ্যে, ভাষা আর সংস্কৃতির মধ্যে। এবং এই সেতু বিস্তৃত হয় আঞ্চলিক ভাষা থেকে জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ভাষা থেকে আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যেও। শিশুর অধিকারের প্রশ্নেও এই ভাষা-সচেতনতার কথা আমাদের ভাবতে হবে। প্রথম ভাষার মাধ্যমে বহুভাষিকতাচর্চার যে ছায়াপাত ঘটছে বিদ্যালয়স্তরে, তাকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করাই এখন প্রধান দায়িত্ব, এ রাজ্যের ভাষিক বাস্তুতন্ত্রের সাম্য বজায় রাখতে চেয়েই আমরা এখন মুখোমুখি কঠিন চ্যালেঞ্জের।❑

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য; পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা পর্ষদের বিদ্যা পর্ষদের সদস্য; পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম সমিতির সদস্য; এবং উচ্চ ও স্কুল শিক্ষা দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত 'শিক্ষা দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় সদস্য।]

৪০তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা

(মিলন মেলা প্রাঙ্গন, ২৭ জানুয়ারী - ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬)

প্রকাশনা বিভাগের স্টল নং

৪৭৬

প্রকাশনা বিভাগ
তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগ, ভারত সরকার
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

গ্রামীণ কিশোরীদের মধ্যে নেতৃত্বের জন্য দক্ষতা বিকাশের প্রেরণা

ডিজিটাল যুগে সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষাবিজ্ঞান

মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার অনেকটাই কম (পুরুষদের তুলনায়)। এই নিম্নহার ভারতের গ্রামাঞ্চলে নারীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ এবং প্রতিফলনও বটে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি প্রয়োগ করে কীভাবে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা সম্ভব আলোচনা করছেন **ড. পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি।**

লেখার শুরুতেই দুটি বিধিসম্মত সতর্কীকরণ রাখতে চাই—প্রথমত, একথা সত্যি যে এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং আসামের কামরূপ জেলার ১৮১ জন মেয়েকে এই প্রকল্পের জন্য যে নির্ধারণ করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে লিখিত। সময়ের ব্যাপ্তিকাল আর ছাত্রীর সংখ্যা—দুটিই ছিল সর্বজনীন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আর দ্বিতীয়ত, রচনাটিতে কোনওভাবেই কোনও সরকারি নীতিকে সমালোচনা করা কিংবা সেই প্রাতিষ্ঠানিক বা কোনও কর্তৃপক্ষের স্তরে কোনও ফাঁকি কত খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়নি।

ভারত যখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে এবং আইন যখন বহু কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অঙ্গীকার করেছে, তখনও গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে খুব সামান্য প্রচেষ্টাই নজরে এসেছে। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সমাজের এই প্রবণতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ সমদর্শিতা, ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা, সাম্যভাব ও সুবিচারের প্রতিজ্ঞা আর আদর্শকে সামনে এনেছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ততটা উজ্জ্বল নয়, অন্তত আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। আসামে, ভারত সরকারের ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী নারী সাক্ষরতার হার ৬৭.২৭ শতাংশ, যা জাতীয় স্তরে পুরুষদের সাক্ষরতার জাতীয় গড়ের (৮২.১৪ শতাংশ) চেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ কম। পশ্চিমবঙ্গে নারী সাক্ষরতার হার ৬৬.৫৭ শতাংশ যা জাতীয় স্তরে পুরুষদের সাক্ষরতার গড়ের চেয়ে ১৬ শতাংশ কম। উপরন্তু, দেখা গেছে আসামের ৮৫.৯০ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬৮.১৩ শতাংশ নাগরিকই গ্রামীণ অঞ্চলের।

উপরের পরিসংখ্যানটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নারী সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আরও বহু কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষত আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে। আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে পড়া কিশোরীদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল সংক্রান্ত আলোচনায় তাই উঠে আসবে তাদের সরাসরি বা চুঁইয়ে পড়া নীতির মতো সমাজের অন্য মেয়েদের সাক্ষরতার হারকে উন্নত করে তোলার চেষ্টার কথা, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টার প্রসঙ্গ। যাইহোক, এমন একটি প্রকল্পকে গ্রহণ করার সুযোগ আসে ২০১৪-১৫ সালে, The Fulbright Distinguished Award in Teaching Program-এর কার্যপরম্পরায়। স্কুলগুলিকে দেখতে যাওয়া ছিল আমাদের কর্মসূচিরই অঙ্গ। তাতেই আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার বিষয়টি। ব্লুমিংটনের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাঠক্রম আমাদের নানাবিধ প্রেরণাদায়ী কৌশল শিখিয়েছিল।

সেই ধারণাটি দানা বাঁধে যখন আমরা দুই সঙ্গীর সঙ্গে জোট বেঁধে কাজটি করি; একজন কাজ করছিলেন ক্যাপস্টোন প্রোজেক্টে, যা মরক্কোর গ্রামের 'বার্বার' মেয়েদের নিয়ে, আর অন্যজনের বিষয় ছিল চারিত্রিক শিক্ষা। বিশেষত, আমাদের ক্যাপস্টোন প্রোজেক্টের বিষয়ই ছিল যোগাযোগের দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধান আর সিদ্ধান্ত নির্মাণের ক্ষমতা তৈরির কৌশল।

যদি আপনি গভীরভাবে লক্ষ করেন, বুঝতে পারবেন এই পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলি নিতান্ত শুষ্ক নয়। তারা অনেক অপমান, অমর্যাদা আর কলঙ্কের কান্নায়, শ্রমজনিত ঘামে, সামাজিক নানান রীতিনীতির পেষণে আর্দ্র। এই তথ্য বা উৎপত্তিগুলি এক সত্যকে প্রকাশ করে এবং এই প্রকল্পটি গঠিত হওয়ার প্রয়োজনকে উত্থাপিত করে।

লিঙ্গের ধারণা একটি সামাজিক গঠন। ফরাসি নারীবাদী এবং পোস্ট-স্ট্রাকচারাল পণ্ডিত জুলিয়া ক্রিস্টেভা তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন নারীত্ব হল একটি নির্বাচনের বিষয়। তাঁর প্রদত্ত সূত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে পৌরুষও তাই। জুডিথ

বাটলার ক্রিস্টেভার বক্তব্যের সারমর্মের সঙ্গে যৌনতার ধারণাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আরও এগিয়ে তিনি বলেন, যৌনতার ধারণা যদিও একটি প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্তীয় গঠন, তবুও তার মধ্যে বৈপরীত্যময় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কথায়—If the regulatory fictions of sex and gender are themselves multiple contested sits of meaning, then the very multiplicity of their construction holds put the possibility of a disruption of their univocal posturing.

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া যথেষ্ট অস্বস্তিকর। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। শিক্ষা সমাজ প্রগতির সূচক এবং এর মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ে সমাজ কীভাবে পুরুষ ও নারী এবং সামাজিকভাবে অগ্রগণ্য ও পিছিয়ে পড়া নারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে আজও ক্রিস্টেভা, বাট্‌লার বা ভার্জিনিয়া উলফের বক্তব্য সামাজিক প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যরহিত নয়। যদিও ইউরোপীয় নারীবাদ এবং ভারতীয় নারীবাদের মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে।

গবেষণার প্রশ্নাবলি

এই সন্দর্ভটি দুটি মূল গবেষণার প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথমটি হল নারীদের কিছু সমাজস্বীকৃত গতানুগতিক ভূমিকা, যা কিশোরীদের ভবিষ্যৎ জীবনের অগ্রগতিতে বাধা দেয়, এই ভূমিকার মধ্যে প্রধানত রয়েছে মাতৃত্ব আর প্রতিপালন। এই দুই সমস্যা যে শুধু বাল্যবিবাহপ্রসূত তাই নয়, বড় পরিবার, পরিবার প্রধানের উন্নাসিকতা বা অক্ষমতাও এর জন্য দায়ী। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল কিশোরীদের উপর ন্যস্ত বিপুল সাংসারিক দায়ভার। তারা বিভিন্ন বাড়িতে, কারখানায় কাজ করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মরশুমি কাজে যোগ দেয়।

এই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য যোগাযোগের দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তা করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যদি কিশোরীরা অর্জন করতে পারে, তাহলে লিঙ্গভিত্তিক ও যৌনতাভিত্তিক দুঃসহ কাজ থেকে তারা মুক্তি পাবে। এই দক্ষতাগুলি যাতে তারা শিখতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই দক্ষতাগুলিকে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রয়োগ করার মাধ্যমে কিশোরীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে পারে।

চাহিদার প্রকার

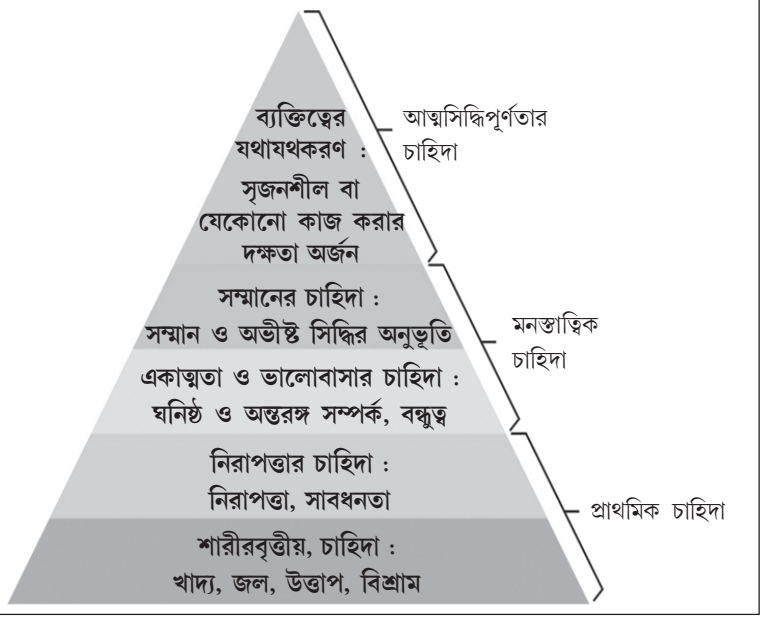

বান্দুয়ার ত্রিমুখী ও পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ম/পরিণামবাদ

পদ্ধতি

উপরোক্ত আলোচনাটি দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি প্রেষণামূলক তত্ত্বের উপর। যেমন—

Expectancy theory : ১৯৫০-এর দশকে জন উইলিয়াম অ্যাটকিনসন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। ১৯৮০-র দশকে জ্যাকেলিন এক্‌লেস এই তত্ত্বকে শিক্ষাতত্ত্বে প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্বটি বলে যে, মানুষের কাজের প্রেষণা নির্ভর করে যে লক্ষ্য সে স্থির করেছে, তার উপর এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মূল্যের উপর।

Self-efficacy theory : ১৯৮৬ সালে অ্যালবার্ট বান্দুরা এই তত্ত্বের কথা শোনান। মানুষ যেহেতু নিজের সম্পর্কে

চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে এবং সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করে, স্ব-মূল্যায়ন করে এবং সেই স্ব-মূল্যায়নের ফল অনুযায়ী পরিস্থিতি অনুসারে নিজের ব্যবহারে রূপান্তর ঘটাতে পারে। এই ব্যবহারের রূপান্তরের দক্ষতা প্রেষণার একটি মূল উপাদান, কারণ মানুষের ব্যবহার তার সামাজিক সাফল্যের একটি প্রধান উপাদান।

Goal setting theory : ১৯৬০-এর দশকে এডুইন লক কথিত এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল লক্ষ্য নির্ধারণের উপর মানুষের প্রেষণা নির্ভর করে। লক্ষ্য যদি খুব সহজ বা খুব কঠিন হয়, তাহলে মানুষ আগ্রহ হারায়, হতোদ্যম হয়ে পড়ে। লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে তা খুব সহজলভ্য না হয়, আবার তা না অসাধ্য হয়ে পড়ে। একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর মানুষ যেন আরেকটি লক্ষ্য দেখতে পায়। এই সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের দ্বারা মানুষকে নানান কাজের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

Self-determination theory : ১৯৮০-র দশকে দেচি এবং রায়ানের দ্বারা কথিত এই তত্ত্বটি দু'ধরনের প্রেষণার কথা বলে—অন্তর্গত ও বহির্গত। অন্তর্গত প্রেষণা মানুষের স্ব-মূল্যায়নের ফসল আর বহির্গত প্রেষণা যে লক্ষ্য যে নির্ধারণ করেছে, তার দ্বারা গঠিত। এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে, মানুষ কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হয় যখন তার কাজের প্রশংসা হয়, সেই কাজে সৃজনশীলতা থাকে এবং যখন কাজটি তার ভালোলাগা থেকে উৎসাহিত হয়।

এই চারটি প্রেষণামূলক তত্ত্ব ছাড়াও এই সন্দর্ভটি আব্রাহাম মাস্‌লোর (১৯৪৩) এবং ড্যানিয়েল পিঙ্ক (২০০৯)-এর প্রেষণের উপর নির্ভরশীল। মাস্‌লোর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রেষণার সঙ্গে প্রয়োজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এই প্রয়োজনগুলি মেটানোর তাগিদ মানুষকে কাজের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে। পিঙ্ক ২০০৯-এ তিনরকম প্রেষণের কথা বলেন। ১.০, ২.০, ৩.০। ১.০ অনুযায়ী মানুষের শারীরিক প্রয়োজনীয়তা এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার তাগিদ মানুষের প্রেষণার উৎস হতে পারে। ২.০ অনুযায়ী মানুষের সম্পর্ক রাখার তাগিদ, সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রেষণার কারণ হতে পারে। ৩.০ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে—ব্যক্তিস্বাধীনতা, আধিপত্য বা দখল এবং উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার মাধ্যমে একজন মানুষ একটি নির্ধারিত কাজকে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করতে পারে, কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার পথ নির্ধারণ করতে পারে এবং কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তার যা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করতে পারে। আধিপত্য একটি কাজকে করার জন্য নানান পথ বের করতে পারে এবং একটি সুচিন্তিত পথ বেছে নিতে পারে। কাজের উপর আধিপত্য অন্যদের কাজ করতেও উদ্বুদ্ধ করে। তা অন্যদের কাজের সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতেও সহায়তা করে।

কাজের উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট থাকে, তাহলে সেই উদ্দেশ্যতে পৌঁছানোর জন্য মানুষ নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কত সহজে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যায় এবং দলগত কাজের ক্ষেত্রে 'আমার' গুরুত্বের চেয়ে 'আমাদের' গুরুত্বের ধারণায় সহজেই উপনীত হওয়া যায় তা বুঝতে সাহায্য করে।

নেতৃত্বের দক্ষতা

এই প্রেষণের তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নলিখিত চারটি নেতৃত্বের দক্ষতা আয়ত্ত করা সম্ভব :

১. পরিকল্পনা করার ক্ষমতা
২. ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা
৩. সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা
৪. সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা

এই ক্রমটি বিষয়ের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে গঠিত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ	গুরুত্বহীন
জরুরি	না-জরুরি
(পাভলভের জানালা)	

পরিকল্পনা

মানুষের জীবন যে নানান সমস্যা দ্বারা বেষ্টিত সেই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা করা এবং কোন সমস্যাটির সমাধান প্রথম করা দরকার, তা নির্ধারণ করা (যেমন—পাভলভের জানালা ব্যবহার করে) সম্ভবপর।

ব্যাখ্যা

গার্ডেনার (১৯৯৪) বলেন, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নেতৃত্ব প্রদানের একটি প্রধান গুণ। ব্যাখ্যা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এটি ধারণা, পরিস্থিতি বা সমস্যাকে নিজের কাছে স্পষ্ট করে তোলে, একই সঙ্গে অন্যের কাছে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এই ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আর সৃষ্টিশীল চিন্তা গড়ে ওঠে।

সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পাওলো ফ্রয়ার (১৯৭০) তাঁর বিখ্যাত বই 'The pedagogy of the oppressed'-এ প্রমাণ করেন যে এই দুটি সক্ষমতা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনমুখী কাজের মধ্য দিয়ে কিশোরীদের এই দুই দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে লুকিয়ে আছে লিঙ্গবৈষম্য ও যৌনবৈষম্যের অবসানের বীজ।❑

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য। ২০১৪-১৫ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফুলব্রাইট স্কলার' ছিলেন। ২০১০ সালে তিনি আইজ্যাক সিক্যোয়েরা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত হন।]

উল্লেখপঞ্জি :

1. Pink, Daniel (2009). *Drive : The Surprising Truth About What Motivates Us.,* Riverhead Books, New York City.
2. Bandura, Albert (1986). *Social Foundations of Thought and Action : A Social Cognitive Theory,* Prentice Hall, New Jersey. Bandura's Triadic Reciprocal Determinism may be used as an important tool for creating the Quality-Motivation nexus in In-service teacher training programmes.

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

এ দেশের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা নিয়ে বরাবরই উঠে এসেছে অনেক প্রশ্ন। বিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে এই সামগ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থায়। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মান যাচাইয়ের সুযোগ এখানে বড় কম। বিভিন্ন কমিশনের নানান সুপারিশ সত্ত্বেও মান্ধাতার আমলের নিয়মই এখনও চলেছে। বিশ্বের অন্য দেশগুলি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কারের নানান উদ্যোগ নিচ্ছে সেখানে আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়ছে কেন? বিশ্লেষণ করেছেন **অধ্যাপক অবতার সিং।**

ত্রুটি-বিচ্যুতি

শিক্ষার্থীদের মান নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা—এই শব্দগুলির সঙ্গে আমরা সকলেই কম-বেশি পরিচিত; কিন্তু এগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম তফাতটা রয়েছে তা বোঝার চেষ্টা আমরা করি না। আমরা এগুলিকে নিছক একটা ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবেই দেখি যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর দেওয়া হয়, বা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় এবং এই নম্বরের ভিত্তিতেই ছাত্র-ছাত্রীরা এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় ও তাদের শংসাপত্রও তৈরি হয়। আমাদের প্রত্যেককেই যেহেতু জীবনে একাধিক পরীক্ষায় বসতে হয়েছে তাই পরীক্ষা নিয়েই আমাদের যত মাথাব্যথা। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাটা সত্যিই আন্তঃসারশূন্য। অনিশ্চয়তা, ধোঁয়াশা, সর্বোপরি গ্রহণযোগ্যতার অভাবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও এই পরীক্ষাব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখতে পারে না। প্রশ্নপত্র তৈরি, প্রশ্নপত্র বিতরণ, উত্তর লেখা, ট্যাবুলেবন, সবশেষে খাতা দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর দেওয়া—পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাটাই অস্বচ্ছ। সামগ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। অথচ এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়, তাদের র‍্যাংক বা পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়, তাদের এক শ্রেণি থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতও করা হয়। এই ব্যবস্থার অস্বচ্ছতায় কোনও পরীক্ষার্থীর ভাগ্য খুলে যেতে পারে, আবার কোনও পরীক্ষার্থীর কেরিয়ারের সর্বনাশও হয়ে যেতে পারে (দ্রষ্টব্য বক্স-১)। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখা নিয়ে পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রথম দুটি বুলেটের তথ্য দেওয়া হল।

- বোর্ডের পরীক্ষায় এক শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নটিকেই আবার নতুন করে খাতায় লিখেছে। দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানে সে ৭০-এ মধ্যে ৩২ পেয়েছে।
- এক শিক্ষার্থী যেসব প্রশ্নের উত্তর নিজে জানত সেগুলিই সে পরীক্ষার খাতায় লিখে এসেছে। পরে দেখা গেছে এই প্রশ্নগুলির মাত্র কয়েকটিই ছিল প্রশ্নপত্রে। অথচ দশম শ্রেণির সমাজবিদ্যায় সে ১০০-র মধ্যে ৭৮ পেয়েছে।
- সেমেস্টারের একটি বিষয়ে NIT-এর এক শিক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি। লজ্জায় সে আত্মহত্যা করে। বাবা-মা তার খাতার পুনর্মূল্যায়ন করে দেখেন ৫০-এর মধ্যে ৪৮ পেয়েছে সে। কিন্তু ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে একটা মূল্যবান জীবন।

সম্প্রতি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি সংবাদের ভিত্তিতে তৃতীয় বুলেটের তথ্যটি দেওয়া হল।

মান নির্ধারণ বা মূল্যায়নে ধারণাগুলি আরও স্পষ্ট। শিক্ষালাভের সামগ্রিক ফলাফল অর্থাৎ শিক্ষালাভের পথে বাধাগুলিকে চিহ্নিত করে এই পথ সুগম করে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাই গুরুত্ব পায় এখানে। যেমন ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের (কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কমপ্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন বা CCE) কথাই ধরা যাক। শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং উচ্চ শ্রেণিতে উন্নীত করার আগে শিশুর জ্ঞানার্জন ক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ে যাওয়াই এই ব্যবস্থার মূল কথা। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন প্রয়োগ করা দরকার। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে (৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি) মসৃণভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া এবং এই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিধান রয়েছে এই আইনে। পাশ-ফেল প্রথা না রেখেও শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান ধরে রাখতে এক্ষেত্রে একমাত্র সহায়ক হতে পারে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা (CCE)। কিন্তু এই ব্যবস্থার মূল কথাটা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বুঝে উঠতে পারেননি এবং এই ব্যবস্থার রূপায়ণের সময় কোনও প্রতিষ্ঠানের তরফে যথাযথভাবে এর ওপর নজরদারিও হয়নি।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা—উভয় পক্ষই গোটা ব্যবস্থাটাকেই অত্যন্ত মজার ছলেই নিয়েছে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পরও ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করে লিখতে, পড়তে বা গণিতের প্রথম ধাপগুলোও শেখেনি।

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে NCERT পরিচালিত বিভিন্ন ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (NAS)-এর ফলাফল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার মানের ক্ষতি হয়েছে।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমান এই ব্যবস্থার খোলনলচে বদলানোর জন্য একগুচ্ছ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলি কোনওটাই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বর্তমান পরীক্ষার ব্যবস্থার বদলে একটি সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কারণ পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পরীক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে যে সমস্ত উদ্যোগকে মাইলফলক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১৯৬৮ সালের পরীক্ষাবিষয়ক জাতীয় কমিশন, ১৯৮৬ সালের শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় নীতি এবং ২০০৫ সালের জাতীয় পাঠ্যসূচি কাঠামো। মূল্যায়ন ব্যবস্থাকেই শিক্ষালাভ তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের হাতিয়ার করে তোলার চেষ্টা হয় এই প্রতিটি উদ্যোগের মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সুপারিশগুলির হাতেগোনা কয়েকটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছিল এখনও চলছে। শিক্ষার বুনিয়াদকে আরও মজবুত করার তাগিদে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের তুলনায় বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা—উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার মান নিয়ে আজ একটা বড় প্রশ্ন উঠেছে। সর্ব শিক্ষা অভিযান, RMSA বা RVSA-এর আওতায় যেসব প্রচেষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন কারণে তার কাঙ্ক্ষিত সুফল নাও মিলতে পারে। প্রথমত, এই সমস্ত কর্মসূচির রূপায়ণে আন্তরিকতার অভাব, দ্বিতীয়ত, আগের তুলনায় সমস্ত কর্মসূচির প্রসার, তৃতীয়ত, সমস্ত স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রচণ্ড অভাবের ফলেই এই সমস্ত কর্মসূচির সুফল মেলে না। কর্মসূচির সম্প্রসারণের নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতার অভাবের জন্য দায়ী আমাদের বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশে ১৫ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয়, ৩০ হাজার ডিগ্রি কলেজ, ৫ হাজার কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং ৬৬০টি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৪০টিরও বেশি বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ। এগুলির কাজ শুধু পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশ-ফেল বিচার। পরীক্ষা পরিচালনার পাশাপাশি এই পর্ষদগুলি শিক্ষাদান বা শিক্ষণ প্রণালীর উন্নতির সাধনের ওপরও মনোযোগ দিতে পারে। এই বিরাট শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা নেওয়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ-অধ্যয়ন প্রণালীর উন্নতি ঘটানো যেতেই পারে। শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাকে একই মুদ্রার দুই পিঠ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এদের একে অপরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না।

সারণি-১
বিভিন্ন বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার

বিষয়	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজবিদ্যা
পর্ব-২	৫৬.৫৭	৪১.৩০	৩৭.৭৮	৪৪.১৫
পর্ব-৩	৪৬.২০	৩.২৮	৩৬.৩৭	৩৮.৩৪

সূত্র : NCERT-এর 'ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে' পর্ব-২ (২০০৬-০৮) এবং চক্র-৩ (২০১১-১৩)।

পরিবর্তন প্রয়োজন

পরীক্ষার নম্বর দেওয়া বা মূল্যায়নের জন্য আমরা বহুকাল ধরেই ধ্রুপদী পরীক্ষা তত্ত্ব বা ক্ল্যাসিক্যাল টেস্ট থিওরির (CTT) সাহায্য নিয়ে আসছি। এই ব্যবস্থার কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শংসাপত্র প্রদান ছাড়া এই ব্যবস্থার বিশেষ কোনও কার্যকারিতা নেই। বর্তমানের বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে পরীক্ষা নেওয়া ও পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের একটা সুযোগ রয়েছে। প্রোগ্রাম ফর ইন্টার-ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট (PISA), ট্রেন্ডস ইন ম্যাথেমেটিক্স অ্যান্ড সায়েন্স স্টাডিজ (TIMSS) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিডিং লিটারেসি (PIRLS)-এর মতো সমস্ত আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমে এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে 'আইটেম রেসপন্স থিওরি' (IRT)। এই ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি সুবিধে রয়েছে যেমন :

(১) পরীক্ষা যতই কঠিন হোক না কেন এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায়।

(২) শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একাধিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

(৩) প্রতিটি বিষয়/ধারণার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়।

(৪) একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ফলাফলের নিরিখে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিচার করা যায়।

এই লক্ষ্যে যে দুটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির কথা এখন আমরা উল্লেখ করব।

(১) হিমাচলপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এই দুটি রাজ্যে ২০১০-১১ সালে পরীক্ষামূলক-ভাবে PISA পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ + পর্বে** অংশগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে একে ভালো করে বোঝার জন্যই এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। সেই সঙ্গে, কোনও সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির মধ্যে আবদ্ধ নয়, এমন প্রশ্নের উত্তর আমাদের ১৬ বছরের শিক্ষার্থীরা কীভাবে দেয় তা দেখাও ছিল এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। এই সমীক্ষায় ৭৪টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল এবং শেষের দিক থেকে আমাদের রাজ্যগুলির স্থান ছিল কিরাগজিস্তানের পরেই। এই ফলাফল অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে আরও বেশি করে শামিল হওয়ার কথা ভাবতে হবে। শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযথভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারছে কি না কিংবা অধীত বিদ্যা তারা জীবনে আদৌ প্রয়োগ করতে পারছে কি না তা নির্ণয়ের অত্যন্ত কার্যকর মাপকাঠি হতে পারে PISA। ২০০০ সালের প্রথম পর্ব থেকেই অনেক দেশই এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছে এবং এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় খারাপ ফলাফল হওয়ার পর তারা বিদ্যালয় তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে মনোযোগী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। ২০০০ সালে ব্রাজিলের ফলাফলও আমাদের রাজ্যগুলির মতোই হয়েছিল, কিন্তু PISA ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে ব্রাজিলের ফলাফল অনেক উন্নত হয়েছে (দ্রষ্টব্য সারণি-২)।

(২) জাতীয় স্তরে NCERT-এর তরফে দেশজুড়ে নমুনার ভিত্তিতে শিশুদের শিক্ষার মান মূল্যায়নের এক উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায়

বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত উপকরণ দেওয়া হয়েছে তার পরিণামে শিশুদের শিক্ষার মান কতটা উন্নত হল তা চিহ্নিত করতে একেবারে প্রাথমিক (বেসলাইন), মধ্যমেয়াদি এবং মেয়াদ শেষের সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ধীরে ধীরে এই সমীক্ষাগুলির ফলাফলের ভিত্তিতে মেয়াদ শেষের (চক্র-৩) ও পরবর্তী পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে IRT মডেলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমীক্ষার সুবিধাগুলি হল—

(১) প্রতিটি বিষয়ে তালিকা ধরে ধরে ফলাফল বিচার করা যায়।

(২) প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ধরাণা/ভুল ধারণাগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

(৩) পুরো ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা যাচাই করতে সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনা গুণমান সূচক বা সিস্টেম্যাটিক কোয়ালিটি ইনডেক্স (SIC)-এর সাহায্য নেওয়া যায়। এটা একটা ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড এবং বর্তমানে পর্ব-৪-এর কাজ চলছে। এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এই ব্যবস্থায় যে বিপুল সংখ্যক তথ্য উঠে আসছে সেগুলির সাহায্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও এই উদ্যোগো সক্রিয়ভাবে অংশীদার হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি এই আদলে নিজেদের মতো করে রাজ্যভিত্তিক সমীক্ষার আয়োজন করেছে। এই কাজে রাজ্যগুলিকে সহায়তা দিচ্ছে NCERT।

সামনের পথ

মূলত তিনটি ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থার রূপায়ণ চাই।

(১) বিদ্যালয় স্তরে ভাষার ব্যবহার (যে কোনও ভাষা) ও তা বোঝাটা সবচেয়ে জরুরি। বিদ্যালয় স্তরেই লেখা, পড়া ও বলার ক্ষমতা গড়ে তোলার পাশাপাশি তার মূল্যায়ন ও উন্নতিসাধনও প্রয়োজন। তা না হলে বিদ্যালয়ছুট ও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের সংখ্যা বাড়বে। বাকিদের পড়ায় আগ্রহ কমবে। গণিতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। ভাষা এবং গণিত—এই দুটি বিষয় ভালো করে বোঝা ও বিষয় দুটিতে আগ্রহের ওপর ভবিষ্যতের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। তাই প্রাথমিক স্তরেই যদি মূল্যায়ন, ত্রুটি-বিচ্যুতি শনাক্তকরণ ও তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তাহলে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে তা অত্যন্ত কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে পাঠ্যসূচি বা প্রশ্নপত্রের ধরনের দিক থেকে বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের ছবিটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও বহির্মূল্যায়নের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করতে হবে শিক্ষা পর্ষদগুলিকে।

(২) আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে. এগুলিতে চালু রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রায় কোনওটাতেই নেই। তাই শিক্ষার গুণমানও আশানুরূপ নয়। BRICS*-এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এ দেশের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রথম পঁচিশটির মধ্যে স্থান পায়নি। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, টিউটোরিয়াল প্রেজেন্টেশন ও প্রজেক্টের পাশাপাশি বহির্মূল্যায়নের এক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দ্বারাই শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা ফলাফল যাচাই করতে হবে এবং ডিগ্রির পড়া সম্পূর্ণ করার পর শংসাপত্র/পোর্টফোলিওতে যেন শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষাগত মানের প্রতিফলন থাকে। গুণমান সুনিশ্চিতকরণ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে নমনীয়তা আনতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা UGC সম্প্রতি ক্রেডিট-গ্রেড ব্যবস্থা চালু করেছে।

(৩) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উদ্ভাবন বা সংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষাব্যবস্থার আদৌ কোনও উন্নতি হচ্ছে কি না যাচাই করার কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেই। নতুন প্রজন্ম কি অনেক বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারছে? এ দেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে এডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস (ETS, প্রিন্সটন, নিউজার্সি, আমেরিকা)-এর মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যেটি কি না উপরোক্ত কাজের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি গবেষণা কাজও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ১৯৮৬ সালের পরীক্ষাবিষয়ক জাতীয় নীতিতে একটি জাতীয় মূল্যায়ন সংস্থা বা ন্যাশনাল ইভ্যালুয়েশন অর্গানাইজেশন (NEO) গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি শুধু আলোচনার স্তরেই রয়ে গেছে।❑

সারণি-২
PISA ২০০৯ চক্রে গড় নম্বর

বিষয়	ব্রাজিল	তামিলনাড়ু	হিমাচলপ্রদেশ	OECD গড়*
পঠন	৪১২	৩৩৫	৩১৪	৪৯৩
গণিত	৩৮৬	৩৫০	৩৩৮	৪৯৬
বিজ্ঞান	৪০৫	৩৪৭	৩২৬	৫০১

*০ থেকে ৭০০ অঙ্কের স্কেলে প্রাপ্ত নম্বরের গড়।

[লেখক NCERT-র এডুকেশনাল মেসারমেন্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন বিভাগ তথা অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল সার্ভে অ্যান্ড ডেটা প্রসেসিং বিভাগের প্রাক্তন প্রধান।
email : avsing3@rediffmail.com]

---

*দ্য টাইমস হায়ার এডুকেশন BRICS অ্যান্ড ইমার্জিং ইকোনমিক ২০১৫—র‍্যাঙ্কিং।

**PISA ২০০৯-এ যেসব দেশ অংশগ্রহণ করেনি তাদের জন্য PISA ২০০৯ + পর্ব চালু করা হয়। এই পর্বে অংশ নেয় কোস্টারিকা, জর্জিয়া, মালয়েশিয়া, মাল্টা, মরিশাস, ভেনেজুয়েলা, মলডোভা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ভারত (হিমাচলপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু)।

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

মেক ইন ইন্ডিয়া মিশনে শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের যোগসূত্র

আর্থিক বিকাশের হার দ্রুতগতিতে বাড়লেও পণ্য উদ্ভাবন, তার মালিকানা, মেধাস্বত্ব সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে। মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে কীভাবে এই খামতি পূরণ করা যায়, তার দিশানির্দেশ করেছেন লেখক **অশোক ঝুনঝুনওয়ালা।** *এক্ষেত্রে শিল্পমহল ও শিক্ষাজগতের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।*

ভারত 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানে নেমেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ভারতের শিল্পগত ভোগ ক্রমশই বাড়ছে। বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ভারতকে যাতে আমদানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে না থাকতে হয়, সেজন্যই এই অভিযানের সূত্রপাত। এর পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কৃষি থেকে সরে গিয়ে অন্য জীবিকার খোঁজ করায় এটাও এখন দেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। গত কুড়ি বছরে, অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ক্রমশই আরও বেশি করে আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এর ফলে একদিকে যেমন আমদানির খরচ হু হু করে বাড়ছে, তেমনি বিকাশশীল অর্থনীতিতে শিল্পে কর্মসংস্থানের প্রায় কোনও উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি পালটানো দরকার।

মেক ইন ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ

আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রের ওপর জোর দিচ্ছি। কী ধরনের উৎপাদন আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে, তা আগে ভেবে নেওয়া দরকার। পাশের ছবিতে বর্তমান বিশ্বের সফলতম একটি পণ্য—আই ফোনের মূল্যে বিভিন্ন উপাদানের ভাগ দেখানো হল। একটা আই ফোনের দাম ৫০০ ডলার। এর মধ্যে মাত্র ৭ ডলার উৎপাদন সংক্রান্ত খরচ। ১৭৪ ডলার পড়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও সাব সিস্টেমের জন্য। আর ৩২১ ডলার হল ডিজাইন, মেধাস্বত্ব এবং বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ। এই ৩২১ ডলারের মধ্যে অর্ধেকও যদি ডিজাইন ও মেধাস্বত্বের জন্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেটাও উৎপাদন সংক্রান্ত খরচের প্রায় ২৩ গুণ দাঁড়ায়। একথা সত্যি যে এটি একটি বৈদ্যুতিন পণ্যের উদাহরণ। এর খরচের ভাগের সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের খরচের ভাগ হুবহু নাই মিলতে পারে। কিন্তু ডিজাইন ও মেধাস্বত্বের খরচ যে মোট খরচের সিংহভাগ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, মেক ইন ইন্ডিয়ার দ্বিমুখী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এর মধ্যে উৎপাদন, ডিজাইন ও মেধাস্বত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। একমাত্র তবেই পণ্যের সংযুক্ত মূল্য উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে, কমবে আমদানি বিল। ভারতীয় নাগরিকরা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় কাজ পাবেন।

ডিজাইন তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধা

সৌভাগ্যবশত গত তিরিশ বছরে ডিজাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের সূচনা চমৎকার হয়েছে। তবে এর বেশিরভাগটাই হয়েছে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে পরিষেবা দিতে গিয়ে। এই সব সংস্থারই ভারতে ডিজাইন সেন্টার রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থাও এদের পরিষেবা দেয়। এর ফলে ভারতে ডিজাইনের কাজ ব্যাপকভাবে হলেও এর সুফল ভারতীয় সংস্থাগুলি পাচ্ছে না। ভারতীয়রা মেধাস্বত্বের অধিকারী হচ্ছেন না। ভারত এখনও পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণে ততটা দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। এর জন্য আত্মবিশ্বাস ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার ধরার পাশাপাশি সেরা পণ্যগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। একমাত্র ব্যতিক্রম হল প্রতিরক্ষা, মহাকাশ ও পরমাণু শক্তিক্ষেত্র। এই কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিতে অনেক সময়েই ডিজাইন সংক্রান্ত গবেষণা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা হয়।

ভারতে তৈরি পণ্যগুলি দ্রুত পরীক্ষা ও মতামত গ্রহণের সুবিধা পেতে পারে। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে, নির্বিচারে আমদানি বন্ধ করলে ব্যবহারকারীদের কম গুণমানের পণ্য বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। ভারতকে এমন গুণমানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে যা বিশ্বের সেরা পণ্যগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। ভারতীয় শিল্পপতিদের দায়িত্ব সেইসব পণ্য বাজারে জনপ্রিয় করে তুলে লাভজনক ব্যবসার সূত্রপাত করা। সরকারের উচিত এমন নীতি প্রণয়ন করা, যা পণ্যের উন্নয়নে উৎসাহ দেবে এবং শিল্পগত প্রতিবন্ধকতা দূর করবে।

ভারতের দুর্বলতা

আটের দশকে ভারতে মাত্র একশোটির মতো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, যা থেকে প্রতিবছর কুড়ি হাজারের কাছাকাছি ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে বেরোতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলেও তার সুযোগ পেতেন না। নয়ের দশকেও একই অবস্থা ছিল। একুশ শতকে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো গড়ে উঠতে শুরু করল, বাড়ল সরকারি কলেজের সংখ্যাও। কিছুদিন আগেও দেশে মাত্র ৬টি IIT ছিল। আজ এর সংখ্যা কুড়ির বেশি। এছাড়া ৩০টি NIT, IIIT, ISER ও NISER গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষায়, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় বিনিয়োগ অনেক বেড়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়িয়েছে। সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমে ভর্তি হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি সাম্যের ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর যে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় তার ২৫ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে থেকে আসা, ২৫ শতাংশের বাস গ্রামীণ এলাকায়।

Context: Where is the Value-add in iPhone?

USD 500 cost iPhone has

$174 components, subsystem
$ 7 manufacturing
$ 321 sales & distribution, design and IPR, profits
Sales and distribution: less than $100
$221+ in design / IPR / branding and profits

Over time the profits and IPR will go down (commodity) as price goes down

What was the investment: USD 500+ M

Learning for India:

Focus more on IPR/Products
Fits into India's core strengths
large talent base, huge domestic market

Product development requires much less capital as compared to assembly/manufacturing

সূত্র : টাইম পত্রিকা (১৬ মে, ২০১১)

কিন্তু সংখ্যা ও সাম্য সুনিশ্চিত করা গেলেও নজর দেওয়া হয়নি মানের ওপর। IIT ও সামান্য কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়া সর্বত্রই মান অত্যন্ত নীচে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় মান বাড়াতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি কমিটি গঠন করেছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মান একটি নির্দিষ্ট স্তরে নিয়ে যাবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এই বিস্তার ভারতে ডিজাইন সংক্রান্ত পরিষেবা শিল্পের ভিত গড়ে দিয়েছে। যাঁরা স্নাতক হয়ে বেরিয়েছেন, তাঁদের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। মূলত নতুন কলেজগুলিতে শিক্ষকদের মান খুব একটা ভালো না হওয়ায় তার ছাপ পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। তবে এই স্নাতকদের চাকরি দিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করে নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রের বেতন অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় বেশি হওয়ায় যুব সম্প্রদায়ও এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কাজের উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা সব খামতি ছাপিয়ে যেতে পারবে।

ভারত পণ্যের মালিকানা ও তার বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে পিছিয়ে। মাঝেমধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সেগুলি যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বিকাশলাভ করায় দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এখন শিল্পপণ্যের বড় উপভোক্তা। এই শিল্পপণ্যের অধিকাংশই আমদানি করা। এর ফলে ক্রমশ বেড়ে চলেছে আমদানির বিলও।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' মিশনের অন্যতম বড় কাজ হল এই কলেজগুলির শিক্ষাগত মানের উন্নয়ন ঘটানো, যাতে এখানকার স্নাতকরা যথাযথ পেশাগত দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন। গবেষণা ও উন্নয়ন, মেধাস্বত্ব সৃষ্টি, ডিজাইন, পণ্যের উন্নয়ন ও পরীক্ষা, বড় মাত্রায় উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ—সবক্ষেত্রেই যাতে এই স্নাতকরা দক্ষ হয়ে ওঠেন, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে।

ভারতে মূল্য সংযোজন এবং পণ্য শিল্প

পণ্যে মূল্য সংযোজিত হয় যেগুলির মাধ্যমে, তা হল—

ক) ডিজাইন, উন্নয়ন ও মেধাস্বত্ব (সফটওয়্যার সমেত)
খ) উপাদান ও সাব সিস্টেম
গ) প্যাকেজিং
ঘ) উৎপাদন (একত্রীকরণ ও পরীক্ষাসহ)
ঙ) বিক্রি, বিপণন ও বাণিজ্যিকীকরণ

আসুন, দেখা যাক, ভারত এই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঠিক কোথায় আছে। ভারতকে অনেক উপাদানই আমদানি করতে হয়। আমদানির পরিমাণের ওপর এর খরচ নির্ভর করে। উৎপাদন যদি বৃহদায়তন না হয়, তাহলে উপাদানের খরচ অনেক বেশি পড়বে। ভারতে পণ্য ডিজাইন ও বিপণনের স্থানীয় বাজার দুর্বল হওয়ায় এখানকার উপাদান শিল্পও ততটা মজবুত নয়।

একদশক আগেও ভারতে উৎপাদন ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু টেলিকম হ্যান্ডসেট সংস্থাগুলি এখন ভারতেই উৎপাদন করায়, বর্তমানে এখানে একত্রীকরণ শিল্পের বেশ প্রসার হয়েছে। লাভবান হয়েছে অটো, বৈদ্যুতিন প্রভৃতি ক্ষেত্র। ভারত এখন পণ্য উৎপাদনে প্রস্তুত।

ভারতের মেধাস্বত্ব সৃষ্টির ক্ষমতা

IIT-র নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেসব শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্ররা রয়েছেন, তাঁদের মেধাস্বত্ব সৃষ্টির ক্ষমতা

রয়েছে। এঁদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও ক্রমশ বাড়ছে। শিল্পমহলের অনেকেও এই প্রয়াসে যোগ দিতে পারেন, তবে সঠিক নেতৃত্ব দরকার। ভারতীয় শিক্ষাজগৎ এখনও মেধাস্বত্ব সৃষ্টির থেকে গবেষণা প্রকাশের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ভারতীয় গবেষকদের বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার, যেখানে এ সংক্রান্ত বিতর্ক এবং পণ্যের খসড়া মান প্রস্তুত করা হয়। মেধাস্বত্ব যখনই কোনও নির্দিষ্ট মানে পৌঁছোয়, তখনই তার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। যেকোনও প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে সেই পণ্য উৎপাদন করতে চাইলেই তাকে মেধাস্বত্বের অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

অধিকাংশ দেশেই, মানোন্নয়ন বিষয়ক বিজ্ঞানীরা আছেন, যাঁরা মেধাস্বত্ব সৃষ্টিক্ষম গবেষকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের সমন্বয় সাধন করেন। সরকারের সহায়তায় এই সোসাইটিগুলির নেতৃত্ব দেয় শিল্প অথবা শিক্ষা সংক্রান্ত কনসোর্টিয়াম। কোরিয়া, চীন, কানাডা, জাপান, ইউরোপ—সর্বত্রই এই ধরনের সোসাইটি রয়েছে। আমাদের দেশে ২০১৩ সালের নভেম্বরে একটি টেলিকম মানোন্নয়ন সমিতি TSDSI গঠিত হয়েছিল। এই সমিতি ভারতীয় গবেষকদের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। তবে TSDSI কাজ করবে কেবল টেলিকম ক্ষেত্রে। টেলিকম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। IEEE বর্তমানে শিক্ষাজগৎ ও শিল্পমহলের ফোরাম তৈরি করে মান সংক্রান্ত কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ধরনের একটি ফোরাম হল লো ভোল্টেজ DC (LVDC) ফোরাম। সরকারের উচিত, সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে এই উদ্যোগকে আর্থিক ও অন্যভাবে উৎসাহ দেওয়া এবং এগুলিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করা।

মেধাস্বত্ব সৃষ্টি করে তাকে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী করে তুলতে গেলে শিক্ষাজগৎ ও শিল্পমহলকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

ভারতে ডিজাইনের অবস্থা, উন্নয়নের ক্ষমতা এবং পণ্য বাস্তুতন্ত্র

ভারতীয় শিক্ষাজগৎ বৈদ্যুতিন পণ্য ও মেধাস্বত্বের ডিজাইন এবং উন্নয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান এখনও রাখেনি। তবে তাদের সেই জ্ঞান ও ক্ষমতা রয়েছে। প্রয়োজন শুধু গবেষণার অভিমুখটা একটু পালটানোর। বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কাজে উৎসাহ দিতে হবে।

দেশে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য CDOT, CDAC ল্যাব রয়েছে, আছে CSIR ল্যাব। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে DRDO ল্যাব রয়েছে। আছে পরমাণু শক্তির সঙ্গে জড়িত এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত ল্যাবও। এগুলি থেকে নিজস্ব ক্ষেত্রে কিছু পণ্য উদ্ভাবন করা হলেও এমন কোনও আবিষ্কার সচরাচর হয় না, যার বৃহত্তর বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ এইসব ল্যাবে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। দরকার হল তাঁদের মনোভাবটা বদলানো। বাণিজ্যসফল পণ্য উৎপাদনে তাঁদের উৎসাহিত করা।

পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার কাজ বরং বেসরকারি ক্ষেত্রে বেশি হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য নির্মিত পরিষেবা। কিছুক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির মালিকানাধীন ভারতীয় সংস্থায় এই কাজ হয়। পণ্যের ডিজাইন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় দেশের বাইরে থেকে। কিছু নতুন সংস্থায় পণ্যের ডিজাইন, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের কাজ হলেও সেগুলির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এই সব সংস্থা একযোগে পণ্য উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকীকরণের কাজে নামলে তা ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হবে। একটি ভারতীয় সংস্থার স্লোগান ছিল, 'গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাজ এখানে দ্বিগুণ, খরচ পশ্চিমের তুলনায় অর্ধেক।' এই মনোভাব একান্ত আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর NTTEDB-র মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক ইনকিউবেটর গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে এমন একশোটি ইনকিউবেটর আছে। এর মধ্যে অনেকগুলিতেই পণ্য উদ্ভাবনের বিষয়ে সচেতনতা ও উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে। জৈবপ্রযুক্তি দপ্তরও একই ধরনের কর্মসূচি শুরু করেছে। এছাড়া রয়েছে উদ্যোগপতিদের ফোরাম এবং প্রাক্তনী সংগঠন।

প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরা ছাত্ররা এখন উচ্চতর শিক্ষা বা মোটা মাইনের চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়ার বদলে দেশে এইসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগকে বেছে নিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত গবেষণা পার্ক : পথিকৃৎ IITM

ভারতকে পণ্যের ডিজাইন, উন্নয়ন, মালিকানা, উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণের কাজে দড় করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক

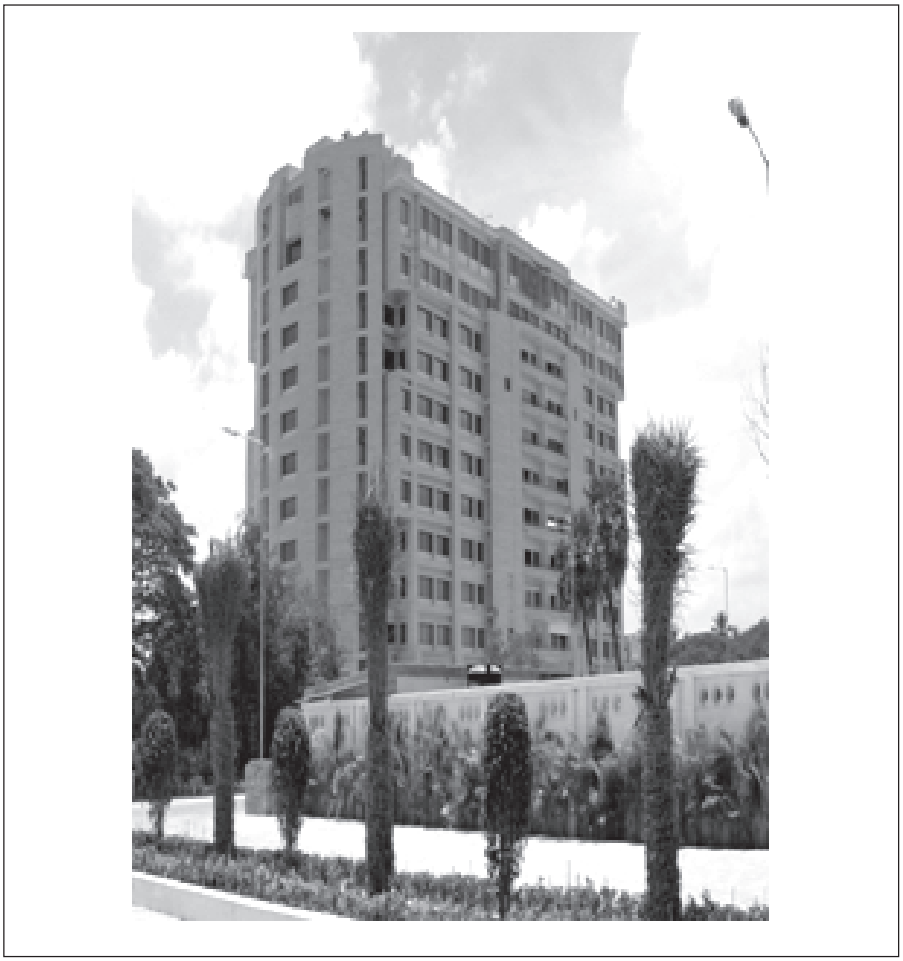

গবেষণা পার্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এই পার্কে শিল্প সংস্থাগুলিকে গবেষণাগার স্থাপনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই গবেষণাগারে কাজ করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষক, অভিজ্ঞ শিল্পকর্তা ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা মত বিনিময় করেন, ভাবনার আদান-প্রদান হয়, যা উদ্ভাবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শিক্ষকের আছে জ্ঞানের গভীরতা, অভিজ্ঞ শিল্পকর্তা জানেন কীভাবে ধারণাকে বাস্তব পণ্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে হার না মানা অধ্যবসায়। এই তিনের সংমিশ্রণে অসীম সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই ধরনের পার্কগুলি শিল্পমহল ও শিক্ষাজগতের সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। IIT মাদ্রাজ, দেশের প্রথম গবেষণা পার্ক গড়ে তুলেছে। এটি পরিচিত IITM রিসার্চ পার্ক নামে। এর প্রথম টাওয়ারে চার লক্ষ বর্গফুট এলাকায় ৫০টিরও বেশি সংস্থা রয়েছে। এর মধ্যে সদ্যোজাত সংস্থাই ৩০টি। তিন বছরের মধ্যেই এটি একটি উদ্ভাবনী হাবে পরিণত হয়েছে। এর আয়তন আরও আট লক্ষ বর্গফুট বাড়ানো হচ্ছে। দু বছরের মধ্যে এতে আরও ১৫০টি সংস্থা যোগ দেবে। IIT মাদ্রাজের তত্ত্বাবধানে থাকা ১৫০টি সদ্যোজাত সংস্থাও আসবে এতে। এই পার্কে সরকারি-বেসরকারি গবেষণাগারও গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সরকার প্রাথমিক বিনিয়োগের জোগান দিচ্ছে, পরবর্তীকালে লগ্নি আসছে বেসরকারি সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে।

এই পার্কের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, যেসব সংস্থা এখানে গবেষণাগার স্থাপন করছে, তাদের IITM-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্দিষ্ট ন্যূনতম গবেষণার কাজ করতেই হবে। লিজ চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী, প্রতি বর্গফুট এলাকার জন্য তাদের IITM-এর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রিসার্চ ক্রেডিট পেতে হবে। এই প্রথম গবেষণা পার্কে এই ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে সংস্থাগুলির ওপর গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ থাকে। সংস্থাগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গাঁটছড়ার সুফল পায়।

গবেষণা পার্ক ইনকিউবেটর হিসাবে কাজ করে, পরিচর্যা করে সদ্যোজাত সংস্থাগুলির।

IITM রিসার্চ পার্কের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর আর্থিক মডেল। পার্ক নির্মাণের খরচ পড়ে ৪৫০ কোটি টাকার মতো। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এজন্য ১০০ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দিয়েছে। বাকি অর্থের ব্যবস্থা করেছে IITMRP নিজেই। এর কিছুটা ব্যাংক ঋণ, কিছুটা বাজার থেকে ধার করা। বেশ খানিকটা অর্থ এসেছে লিজ অগ্রিম বাবদ। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরাও সামান্য কিছু অর্থের জোগান দিয়েছেন। এই পার্ক একটি স্বাধীন, সেকশন আর্ট কোম্পানি। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই এটি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

তবে এখনও IITM গবেষণা পার্কের কাজ সেভাবে শুরু হয়নি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এমন অন্তত আরও দশটি পার্ক গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এজন্য ইতিমধ্যেই IIT বোম্বে ও IIT দিল্লিকে ১০০ কোটি টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

এর পরের ধাপ হল এই পার্কগুলির গবেষণার মান আরও উন্নত করা এবং এখান থেকে যাতে অনেক ভারতীয় পণ্য বেরোয়, তা সুনিশ্চিত করা। IITMRP-র সাফল্য বহুগুণে বেড়ে যাবে, যদি এই পণ্যগুলি বাণিজ্যিকভাবে সফল করা যায়।

উপসংহার

পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি এর ডিজাইন, উন্নয়ন, মেধাস্বত্ব সৃষ্টি ও সংক্ষরণ 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের অঙ্গ। এর ফলে একদিকে যেমন বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তেমনি কমতে থাকবে আমদানির খরচ। এজন্য দেশে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত এবং IITM গবেষণা পার্কের মতো প্রয়াস আরও জোরদার করা দরকার। ❑

[লেখক মাদ্রাজের (চেন্নাই) আইআইটি-র ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক।
email : ashok@tenet.res.in]

প্রান্তিক তপশিলি জাতি-উপজাতির শিক্ষা

ইস্যু, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতির উপায়

শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি। আমাদের জাতপাতভিত্তিক সমাজে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী যুগ যুগ ধরে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। অসমতার শিকার। সমাজের তথাকথিত মূলস্রোত থেকে দূরে। এদের একপাশে সরিয়ে রেখে দেশে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাটা চরম আহাম্মুকি। এখন তপশিলি শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাদি মোটের উপর জুতসই। স্কুলে তাদের ভর্তি বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্কুলছুট বা ড্রপ আউট। স্কুলছুট রুখতে সমতাভিত্তিক বিদ্যালয়-শিক্ষার নিদান হেঁকেছেন নিবন্ধকার **এস শ্রীনিবাস রাও।**

আমাদের মতো আধুনিক সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে সামাজিক গতিশীলতা অর্জনের হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। সমাজে শ্রেণিভাগ আছে। অসমতা বহু স্থলে দিব্যি কায়েম। সমাজ পুনর্বিন্যাসেও শিক্ষা অন্যতম উপায়। ভারতীয় সমাজ বহুদিন থেকে জাতপাতে বিন্যস্ত। আর মূলত এই জাতপাতের ভিত্তিতে অসমতার এত বাড়বাড়ন্ত। আর্থিক সংগতি, সামাজিক ঠাটবাট, রাজনীতিতে ভাগী হওয়া ও শিক্ষার সুযোগের দিক থেকে কিছু জাত বিশেষ সুবিধাভোগী। আবার কিছু জাত এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তপশিলিদের মতো দলিত সম্প্রদায় সাবেকি ছোটখাটো পেশা আঁকড়ে দিন গুজরান করছে। সধারণভাবে সমাজ বিশেষত গ্রামজীবনে এরা কোণঠাসা। ভারতে আদিবাসীরাও পড়ে আছে সমাজের এক প্রান্তে। তথাকথিত 'মূলস্রোত', 'সভ্য' সমাজ থেকে দূরে। বনজঙ্গল, পাহাড় ও দুর্গম এলাকায়। তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, ধর্মীয় আচার, ভাষা ও জীবনযাত্রা আঁকড়ে ধরে। ভারতীয় সমাজে বাদবাকিদের থেকে তাদের জীবন স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলেজুলে তারা দিন কাটাচ্ছে। সংঘাত নয়, তাদের আস্থা প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের সুফলে এদের হিস্যে কম।

এর ফলে, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে এ সব জাত ও আদিবাসী যুগ যুগ ধরে পিছনে পড়ে আছে। দমন-পীড়ন ও বঞ্চনা এদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। স্বাধীনতার পর, ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজের চল হল। আপামর নাগরিকের সমানাধিকার থাকায় শিক্ষা সমেত সমাজের সব ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য, আগে থেকে সুবিধাভোগীগোষ্ঠীগুলির নাগাল পাওয়া এখনও এদের কাছে অধরা।

ইস্যু

তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা শিক্ষাক্ষেত্রে খানিকটা এগোতে পেরেছে। কিছু ক্ষেত্রে তারা পিছিয়েই। ফলে শিক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক গতিশীলতা প্রক্রিয়ায় তারা আজতক একপাশেই পড়ে আছে। ভারতীয় সমাজে সমতা আনতে তাই এ সব জাত ও আদিবাসীদের জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। ইস্কুল-পাঠশালায় এদের ভর্তির হার দারুণ বেড়েছে। পাঠশালে প্রথম শ্রেণিতে তপশিলি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হার সবচেয়ে সুবিধাভোগীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে তাদের সংখ্যা আসে কমে। সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪-এর মধ্যে তপশিলি জাতির শিশু ভর্তি ২ কোটি ১৩ লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৬৩ লক্ষ। অর্থাৎ, মাত্র এক দশকে বৃদ্ধি ২৪.১ শতাংশ। ওই সময় প্রাথমিকে আদিবাসী শিশু ভর্তি ১ কোটি ১০ লক্ষ থেকে বেড়েছে ১ কোটি ৪৭ লক্ষে। অর্থাৎ ৩৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি। প্রাথমিকের উঁচু ক্লাসেও সেসময়ে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সংখ্যা বেড়েছে ঢের (তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে ৬৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২৯ লক্ষ এবং আদিবাসী ৩১ লক্ষ থেকে বেড়ে ৬৫ লক্ষ)।

গোটা প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হারে তপশিলি জাতির বৃদ্ধি ২০০০-০১-এ ৮৬.৮ শতাংশ থেকে ২০১৩-১৪-তে হয়েছে ১০৭.৭ শতাংশ। আর আদিবাসীদের বেলায় তা ৮৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১০৫.৫২ শতাংশ। তপশিলি ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি অনেকটাই বেশি (ছাত্রী ৪৮.৬ শতাংশ, ছাত্র ১৮.৮ শতাংশ)। অর্থাৎ তপশিলিরা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে আদিবাসী ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি কমেছে ২.৫ শতাংশ। ছাত্রীদের বেলায় অবশ্য ভর্তি বেড়েছে ২৬.৪ শতাংশ। প্রাথমিকে মোট ভর্তির হার বিশেষত ছাত্রীদের এই বৃদ্ধি অবশ্যই এক খুশির খবর।

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক স্কুলছুট অবশ্য খুশির এই আবহ ফিকে করে দেয়। ২০০৮-০৯-এ স্কুলছুট শিশু ৪২.৩ শতাংশ। এর মধ্যে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী যথাক্রমে ৪৭.৯ এবং ৫৮.৩ শতাংশ। অর্থাৎ

এদের প্রায় ৫০ বা তার বেশি শতাংশ শিশু প্রাথমিক গণ্ডি পেরোনোর আগে স্কুল ছেড়ে দেয়। স্কুলছুটের ব্যাপকতা সত্ত্বেও, কেউ কেউ দাবি করেন এতে এখন ক্রমশ ভাটা পড়ছে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এসব যুক্তিতর্ক অবশ্য কোনও কাজে লাগে না। দেশে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—এই দাবি মস্ত হোঁচট খায়। সৌজন্যে স্কুলছুট। উঁচু ক্লাসে এই স্কুলছুট ও ফেল বা অনুত্তীর্ণ হবার ইস্যু আরও বেশি প্রকট। ভর্তি হওয়াটা শিশু ও তার বাপ-মার কাছে বেশ আগ্রহের ব্যাপার। শিক্ষাদীক্ষায় মোটামুটি দড় হবার জন্য স্কুল যাওয়াটা বজায় রাখতে কিন্তু ততটা উৎসাহ থাকে না। তপশিলি জাতি ও উপজাতি ঘরের ছেলেমেয়ে তাই প্রায় নিরক্ষর বা যৎসামান্য শিক্ষিত হয়েই রয়ে যায়। শিক্ষা ও উন্নয়নে দেশের অগ্রগতির পুরোপুরি শরিক হওয়াটা তাদের কাছে অধরাই। চাকরির বাজারে অন্যান্য সামাজিকগোষ্ঠীর রমরমা। সাক্ষরতা ও শিক্ষায় এগিয়ে থাকার সুবাদে পোয়াবারো তাদেরই। সত্যি কথা বলতে, তপশিলিরা যে তিমিরে সে তিমিরেই। হয়তো বা, আরও কিছুটা বেশি। অন্যভাবে বলা যায়, পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষায় ছিটেফোঁটা উন্নয়নের দরুন সমাজে অসমতা আরও জাঁকিয়ে বসেছে।

চ্যালেঞ্জ

তপশিলি জাতি ও আদিবাসী শিশুর শিক্ষার জন্য ব্যবস্থাদি আহামরি না হলেও, মোটের উপর যথেষ্ট জুতসই। সৌজন্যে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ও সর্বশিক্ষা অভিযান। ভর্তি হলেও কিছুদিন বাদে স্কুলে যাবার আগ্রহ তারা হারিয়ে ফেলে। নিদেনপক্ষে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোও হয়ে ওঠে না। স্কুলে বিদ্যাচর্চা চলছে গতানুগতিকভাবে। বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সমতাভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে স্কুলগুলো নিজেদের খুব একটা মানানসই করে উঠতে পারেনি। আর্থিক সংগতি, জাতপাত, সামাজিক পরিচয়ের কাঠামো সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের মধ্যে অসমতা বাড়িয়ে দেয় আরও। শিক্ষক-ছাত্র এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কেও এই অসমতা ছায়া ফেলে। এ সবের সঙ্গে আছে শিক্ষকদের অনীহা এবং বিভেদমূলক ব্যবহার। এ সব কারণে তপশিলি শিশুরা স্কুল থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

শিক্ষকদের একাংশের কাছে তপশিলি শিশুরা 'নির্বোধ', 'অযোগ্য' এবং পড়াশোনার পক্ষে অনুপযোগী। তারা সাবেকি নিম্নস্তরের কাজকর্মের উপযুক্ত। অনেক সমীক্ষায় শিক্ষকদের এই মনোভাবের যথেষ্ট সাক্ষীসাবুদ মিলেছে। কিছু গবেষক এমনকী একথাও বলেছেন যে দলিত ও আদিবাসী শিশুদের সম্পর্কে ভাবা হয় তারা বোকাসোকা, অপরিচ্ছন্ন এবং অসভ্য। শিক্ষাদীক্ষা লাভের পক্ষে তাই উপযুক্ত নয়। সমীক্ষায় এও দেখা গেছে, অস্পৃশ্যতার ধ্যানধারণা এবং সামাজিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা শুধু সমাজে নয়, স্কুলেও বহাল। তপশিলি এবং অন্যান্য গরিব ও নিচুতলার শিশুদের স্কুলে আসায় উৎসাহ দেওয়া মিড-ডে মিল বা দুপুরে খাবার প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পে অনেক ক্ষেত্রে তপশিলি ছাত্রদের সামাজিক বৈষম্য ও দূরে সরিয়ে রাখার মনোভাবের শিকার হওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে। শুধু গাঁয়েগঞ্জে নয়, শহরাঞ্চলেও এসব ঘটে থাকে।

উপায়

স্কুলছুট রুখতে সব শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক বিদ্যালয়-শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতি শিশুদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি খাটে। এ ক্ষেত্রে শুধু সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এগিয়ে আসতে হবে স্কুল এবং সমাজকেও। এ সব শিশুর স্কুলে যাবার টান না থাকলে, শিক্ষায় এদের অংশগ্রহণ বাড়বে কী করে। আর তা না হলে ফারাক বাড়বে আরও। স্কুল-কলেজে ভর্তির সংখ্যা বাড়ানোটাই শেষ কথা নয়। স্কুলকে হতে হবে চিত্তাকর্ষক। সেখানে থাকবে সবার মিলেমিশে লেখাপড়ার চল। তাহলে তপশিলি শিশুরা আরও উঁচুস্তরে পড়াশোনায় আগ্রহী হবে। এর ফলে তারা ঢুকতে পারবে শিক্ষিতদের চাকরির বাজারে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগের চেয়ে অনেক বেশি তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রী। এর দরুন ভারতীয় সমাজে পেশাগত ও অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে তা সাহায্য করবে।

তপশিলি জাতি ও আদিবাসী মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কারণ, এ সব মেয়েদের তাদের সম্প্রদায়ের ছেলেদের তুলনায় ঢের বেশি প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। ফলে তাদের পড়াশোনা চালানোয় হ্যাপা বিস্তর। এক বিশেষ সম্প্রদায়ে জন্মের দরুন, ঐতিহাসিকভাবে দলিত এবং আদিবাসী ছেলেমেয়েরা বহুদিক থেকে বঞ্চিত। বিদ্যালয়কে হতে হবে তাদের মুশকিল আসান। এ সব ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল এবং সমাজকে আরও বেশি করে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। তপশিলি শিশুদের প্রতি আরও বেশি ন্যায়পরায়ণ হওয়া দরকার। তাহলে ভারতীয় সমাজ প্রকৃত গণতান্ত্রিক বলে নিজেকে দাবি করতে পারবে। যে সমাজে সবার জন্য থাকে সম আচরণ।❑

[লেখক নতুন দিল্লির জহওরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জাকির হুসেন সেন্টার ফর এডুকেশনাল স্টাডিজ'-এ 'সোশিওলজি অফ এডুকেশান' বিষয়ক সহযোগী অধ্যাপক।
email : srinivas.zhces@gmail.com]

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার

একটি জাতীয় সম্পদ গঠন

ভারতে গড়ে উঠছে জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার—NDL। কিন্ডারগার্টেন থেকে সর্বাধুনিক গবেষণা—যে কোনও স্তরের অফুরন্ত তথ্যভাণ্ডার এবার এসে যাবে নাগালের মধ্যে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের ছবিটা পুরোপুরি পালটে যাবে। কীভাবে এই পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে, কেমনভাবে এটি কাজ করবে, ব্যবহারকারীরা এর থেকে কী উপকার পাবেন—এককথায় NDL সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানাচ্ছেন এই প্রকল্প নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত **খড়্গপুর আইআইটি-র গবেষকরা।**

সূচনা

পাঠাগারের ধারণাটা বর্তমানে এক আমূল সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি এবং বৈদ্যুতিন আকারে একের পর এক বিষয়বস্তুর সমাহার পুরো ধারণাটাই পালটে দিয়েছে। পাঠাগারের জন্য এখন আর নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন নেই। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠছে ডিজিটাল লাইব্রেরি। ভারতে বহু মন্ত্রক এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা মিশনের আওতায় বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু এত উদ্যোগ সত্ত্বেও ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ ডিজিটাল পাঠ্যসমগ্রী ব্যবহার করতে গিয়ে যে অসুবিধার মুখে পড়েন, তার অধিকাংশেরই কোনও সুরাহা হয়নি। ব্যবহারকারীদের এখনও বৈদ্যুতিন সম্পদ পেতে ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটের ওপর নির্ভর করতে হয়, পৃথকভাবে শিখতে হয় তথ্য পুনরুদ্ধারের কৌশল, ভাষাগত সমস্যার মুখে পড়তে হয়, মানিয়ে নিতে হয় সীমিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগ প্রায় হয় না বললেই চলে।

এই প্রেক্ষাপটে অক্ষরজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে ফারাক কমাতে এবং জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার প্রকল্পের পরীক্ষামূলক সূচনা করে। এতে অর্থনৈতিক, কারিগরি, কৌশলগত, সামাজিক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানের সংযুক্তিসাধন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনমাফিক আধুনিক যুগের উপযোগী মাল্টিমিডিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা এতে রয়েছে। এটি একটি নতুন পাঠাগার নয়, বর্তমান পাঠাগারগুলির সমন্বয়কারক একটি ছাতার মতো।

দেশজোড়া বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের পাশাপাশি ডিজিটাল পাঠাগারকে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের মঞ্চ হিসাবে ভাবা হচ্ছে। এটি ছাত্রদের প্রবেশিকা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের নাগাল পেতে এবং তা নিজের আয়ত্তে আনতে সহায়ক হবে এই উদ্যোগ। গবেষকরা এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। লেখা, শব্দ, ছবি, ভিডিও—সবকিছুই বিশ্লেষণ করতে পারবেন তাঁরা। শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগের নতুন নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাবে এর মাধ্যমে।

পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পে এমন একটি কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা বিষয়বস্তুর আকার ও বৈচিত্রে ভবিষ্যতের চাহিদাও পূরণ করবে। আইআইটি খড়্গপুরে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ২৪ ঘণ্টা সচল পরিকাঠামো এবং এক জানালা অনুসন্ধানের সুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে আছে হার্ডওয়্যার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার টুল ও অ্যাপ্লিকেশন। এতে স্কুল, কলেজ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উপযোগী তথ্যভাণ্ডার থাকবে। এগুলি সংগ্রহ করা হবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত পোর্টাল ও প্রকাশকদের কাছ থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাল ভাণ্ডারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন তথ্য ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। যে কোনও স্তরে, যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও ভাষায় ডিজিটাল শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলবে এটি। এমনকী ভিন্নভাবে সক্ষমরাও এর সুবিধা পাবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই প্রয়াস শিক্ষা-অধ্যয়ন-মূল্যায়ন-জ্ঞান আবিষ্কারের এবং উদ্ভাবনের এক মঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে। এটি হবে এক জাতীয় সম্পদ।

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের মডেল

জাতীয় ডিজিটাল লাইব্রেরির মডেল ডিজিটাল ভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করে তিনটি ধাপে বিন্যস্ত (চিত্র-১)। প্রতিটি ধাপেই যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন পরিষেবা। একদম নীচের ধাপে থাকবে লেখা এবং তা সংগ্রহ করার পদ্ধতি। এজন্য বিভিন্ন বিষয়বস্তু নতুন করে লেখা অথবা সংগ্রহ করা হবে। মাঝখানের ধাপে থাকবে সংগৃহীত তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা। একদম ওপরের ধাপে বিভিন্ন মূল্যযুক্ত পরিষেবা যেমন—শিক্ষাগ্রহণ, ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবার পরিবর্তন, স্থানীয়করণ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। ব্যবহারকারীরা অভিজ্ঞতা নির্ভর অধ্যয়ন, একাধিক ভাষায় বিষয়বস্তু অনুসন্ধান এবং বহুমুখী ইন্টারফেসের সুবিধা পাবেন। এতে মুক্ত পরিবেষার সুযোগও থাকছে, যার ফলে অন্যরা ভবিষ্যতে এতে আরও সংযোজন করতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতেই এর মোবাইল অ্যাপ প্রকাশের তোড়জোড় চলছে।

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের কাঠামো বিকেন্দ্রায়িত। এর নীচের ধাপ, যেখানে বিষয়বস্তুসমূহ থাকবে, সেটি আইআইটি খড়্গপুরে কেন্দ্রীভূত নয়। বরং প্রত্যেক বিষয়বস্তুর মালিক তাঁদের ডিজিটাল ভাণ্ডারে এটি বহন করতে পারবেন। URL-এর মাধ্যমে এর নাগাল পাওয়া যাবে। এই ভাণ্ডারগুলির পৃথক সংযোগ থাকবে সার্ভারের সঙ্গে। এর ফলে ডিজিটাল ভাণ্ডারেও প্রতিটি বিষয়ের খোঁজ পাওয়া যাবে। কোনও ব্যবহারকারী সুনির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের সন্ধান করলেই তাঁর সামনে একটি তালিকা ফুটে উঠবে। তিনি সেই তালিকার অন্তর্গত কোনও বিষয় সম্পর্কে বিশদে জানতে চাইলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট ভাণ্ডার থেকে URL পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে এর পদ্ধতি ও শর্তাবলি নির্ভর করবে সেই বিষয়, তার মালিক, ব্যবহারকারী এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যেই বোঝাপড়া হবে, এর ভেতরে জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার থাকবে না।

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের গঠন সৌষ্ঠবের উদ্দেশ্য

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের গঠন সৌষ্ঠবের নেপথ্যে থাকা উদ্দেশ্যগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি। সেগুলি এখানে বলা হল।

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ ব্যবহারকারী, লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থসূচি পরিষেবা প্রদানকারী, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (যারা ডিজিটাল ভাণ্ডার তৈরি করে পাঠাগারের সঙ্গে নিজেদের ভাণ্ডার সংযুক্ত করেছে), ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান (যারা পাঠাগার ব্যবহার করে), বিভিন্ন মন্ত্রক এবং সরকার। কিন্ডারগার্টেন থেকে অত্যাধুনিক গবেষণা অথবা জীবনভর অধ্যয়ন—সব স্তরের ব্যবহারকারীরাই এর থেকে উপকৃত হবেন।

ব্যবহারের ক্ষেত্র

ওপরের ছবি (চিত্র-২) থেকে দেখা যাচ্ছে, ডিজিটাল ভাণ্ডারের দুটি প্রধান উপাদান

চিত্র-১ : জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের ত্রিস্তরীয় মডেল।

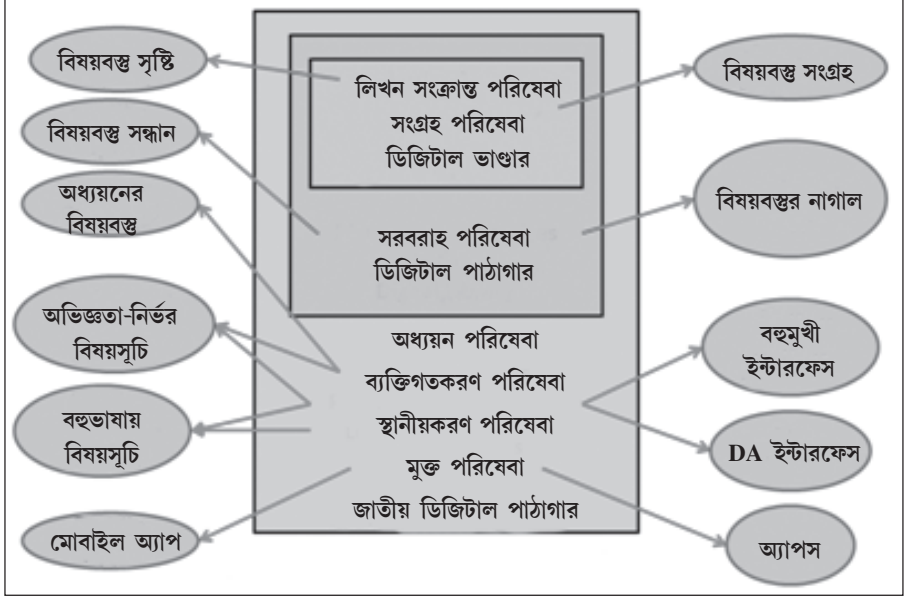

চিত্র-২ : NDL-এর ব্যবহার ক্ষেত্র।

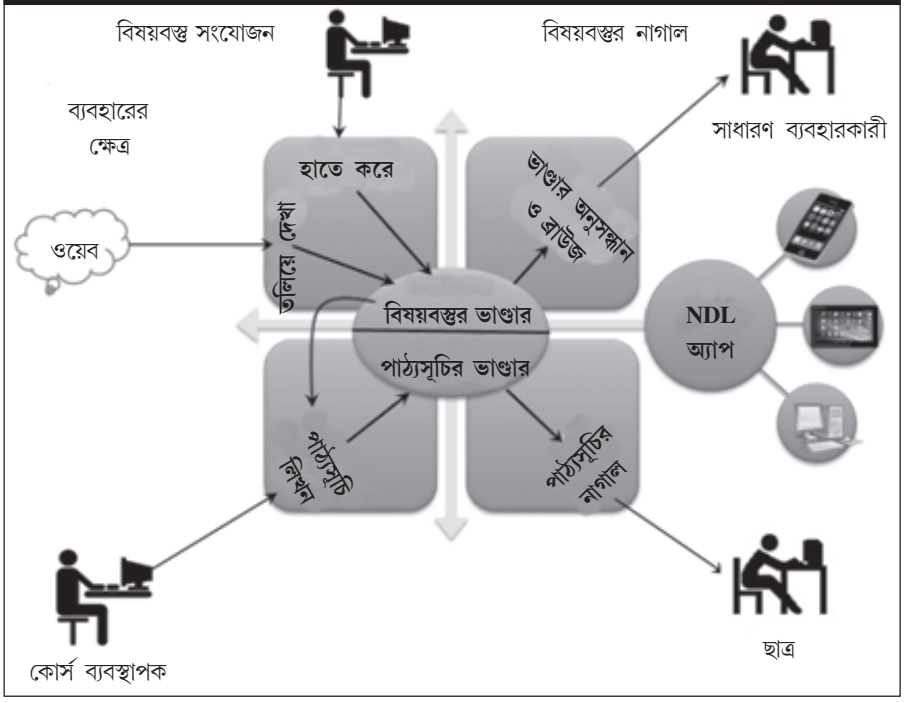

রয়েছে। একটি হল বিষয়বস্তুর ভাণ্ডার এবং অপরটি পাঠ্যসূচির ভাণ্ডার। ওয়েবসাইট ক্রলিং বা হাতে এন্ট্রি করে বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটানো যেতে পারে। পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে কোর্স ডেভেলপাররা অধ্যয়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বিভিন্ন কোর্স তৈরি ও সংযোজন করেন।

বিষয়বস্তু ও মান

সব ধরনের ব্যবহারকারীদের কাছে উপযোগী করে তোলার জন্য ডিজিটাল পাঠাগারকে সব ধরনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এতে রয়েছে সমস্ত ধরনের বিষয়বস্তু—শুধু বই আর জার্নালই নয়, এতে আছে ভিডিও/অডিও, সফটওয়্যার, অ্যানিমেশন, ওয়েব কোর্স, সিমুলেশন, হ্যান্ড অন, ল্যাবের সামগ্রী, প্রশ্ন ব্যাংক, মডেল উত্তর প্রভৃতি।

যেসব ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি, চিকিৎসা, আইন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, কলা, শিল্প,

খেলাধুলো—সব কিছুই আছে।

মেটাডেটা বলতে বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়। মেটাডেটায় কী ধরনের তথ্য থাকবে তা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, সংযোগের পদ্ধতি ও ব্যবহারকারীদের ওপর নির্ভর করে। মেটাডেটা হল যে কোনও ডিজিটাল পাঠাগারের হৃদয়। সেজন্য এর সঠিক গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ডাবলিন কোর, IEEE-LOM, MARC, শোধগঙ্গার মতো বিভিন্ন আদর্শ মেটাডেটা রয়েছে। কিন্তু এর কোনও একটির পক্ষে জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব নয়। নতুন কোনও মান সৃষ্টি করার পরিবর্তে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনার পর, ডিজিটাল পাঠাগারের জন্য Open Virtual Standard গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে মেটাডেটার প্রতিটি উপাদানকে তার ডোমেনের নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (যেমন—ডাবলিন কোরের জন্য 'dc'। শিক্ষাসংক্রান্ত উপাদানের জন্য 'Irmi', অর্থাৎ Learning Resource Metadata Initiative)। যে মানই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাকে অত্যন্ত নমনীয় রাখা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে মেটাডেটাতে আরও সংযোজন করা যায়।

কার্যকর এবং হার্ডওয়্যার স্থাপত্য

ডিজিটাল পাঠাগারের কার্যপ্রণালী ৫ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে। সার্ভার থেকে বিষয়বস্তু আসার পর যেগুলি মজুত করে ইনডেক্স সার্ভারে পাঠানো হয়। এগুলি ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো হয় কনটেন্ট ডেলিভারি সার্ভার এবং LMS সার্ভারের মাধ্যমে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভার। পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় মোবাইল, ট্যাবলেট ও মূল্যযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে।

কার্যস্থাপত্যের ওপর ভিত্তি করে ডিজিটাল পাঠাগারের তথ্য-প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বহুবিধ সার্ভার, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্ক। ৬ নম্বর চিত্রে এটি দেখানো হল।

স্বয়ংক্রিয়তা ও প্রযুক্তি

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারই একমাত্র ডিজিটাল পাঠাগারকে ব্যবহারকারী বান্ধব, সংবেদনশীল, দক্ষ ও ক্রমপ্রসারণশীল করে তুলতে পারে। ওয়েবসাইট ক্রলিং, বহু ভাষা, ভাণ্ডারগুলির সংযুক্তিকরণ, ভিন্নভাবে সক্ষমদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা—এই সব কিছুই প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।

কপিরাইট সুরক্ষা

এই ধরনের কোনও জাতীয় প্রয়াসের পূর্বশর্তই হল কপিরাইট সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এটি একটি জটিল ও সংবেদনশীল বিষয়। সেজন্য ডিজিটাল পাঠাগারের ক্ষেত্রে কেবল মেটাডেটা সংগ্রহ ও মজুতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায় বিষয়বস্তু দিতে চাইলে তিনি তা দিতে পারেন। সাধারণভাবে কোনও ব্যবহারকারী ডিজিটাল পাঠাগারে কোনও বিষয়বস্তুর খোঁজ করলে তাঁকে একটি লিঙ্ক দেওয়া হবে। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তিনি এর উৎস প্রদানকারী সংস্থার কাছে পৌঁছবেন।

চিত্র-৩ : NDL-এর পাঠ্যসূচি।

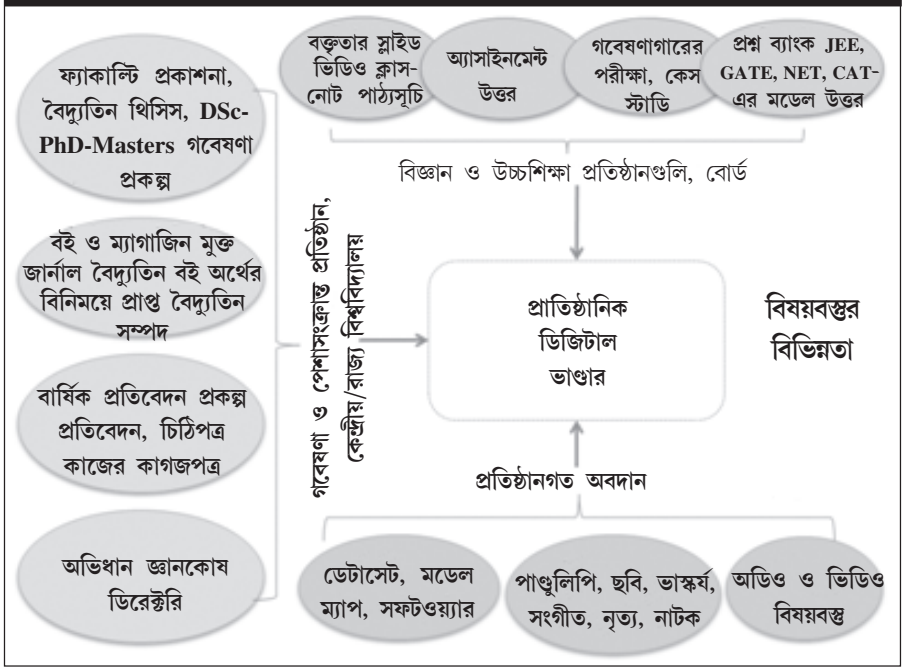

চিত্র-৪ : NDL মেটাডাটার মান।

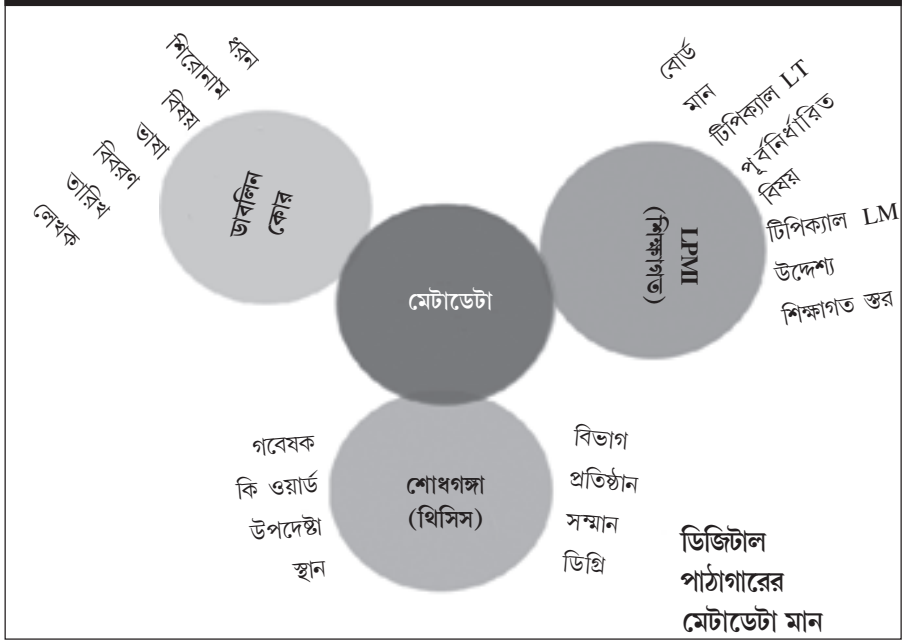

সেই সংস্থা ও ব্যবহারকারীর মধ্যে বোঝাপড়া অনুযায়ী সম্পূর্ণ উপাদান পাওয়া যাবে অথবা যাবে না। চেষ্টা চলছে স্কুলস্তরের বিষয়বস্তুগুলি সম্পূর্ণভাবে পাঠাগারে রাখার।

অন্তর্ভুক্তিকরণ ও মুক্ততা

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের দর্শন হল অন্তর্ভুক্তিকরণ ও মুক্ততা। সব ধরনের, সব এলাকার, সব ভাষার, সব ক্ষেত্রের, সব উৎসের বিষয়বস্তু এখানে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। ব্যবহারের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত। ডিজিটাল পাঠাগারের পরিকাঠামো ও মেটাডেটা সব ধরনের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উন্মুক্ত।

সচেতনতা ও তথ্য সরবরাহ

জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কর্মশালা ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগারের প্রতিনিধিরা। http://www.ndlproject.iitkgp.ac.in/ndl/ ঠিকানার একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যেখানে বিনামূল্যে এ সম্পর্কিত তথ্য মিলবে।

উপসংহার

জাতীয় ডিজিটাল লাইব্রেরি দেশের শিক্ষা আন্দোলনে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে। এই পাঠাগার শুধু বিপুল তথ্যই আমাদের সামনে এনে দেবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি প্রয়োগের পথ সুগম করবে, বহু দীর্ঘকালীন সমস্যার সমাধান করবে এবং এক জাতীয় সম্পদ হয়ে উঠবে।

চিত্র-৫ : কার্যকর এবং হার্ডওয়্যার স্থাপত্য।

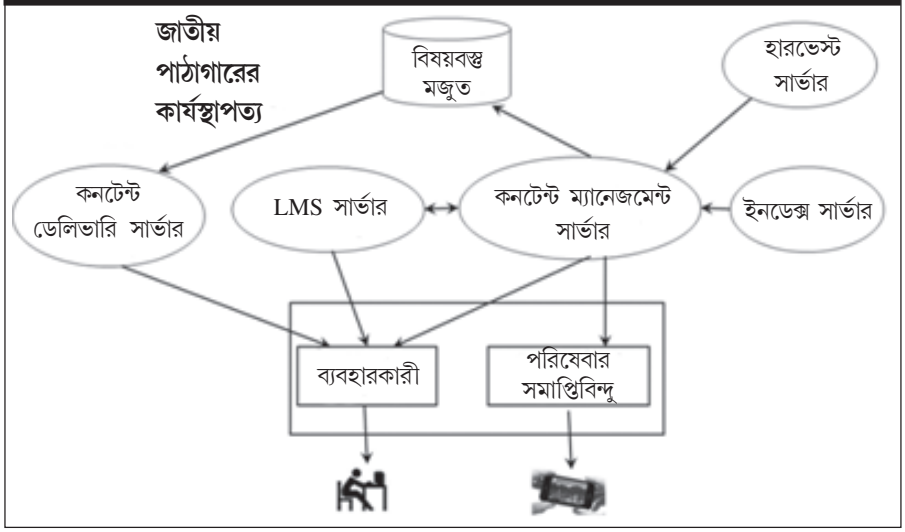

চিত্র-৬ : স্বয়ংক্রিয়তা ও প্রযুক্তি।

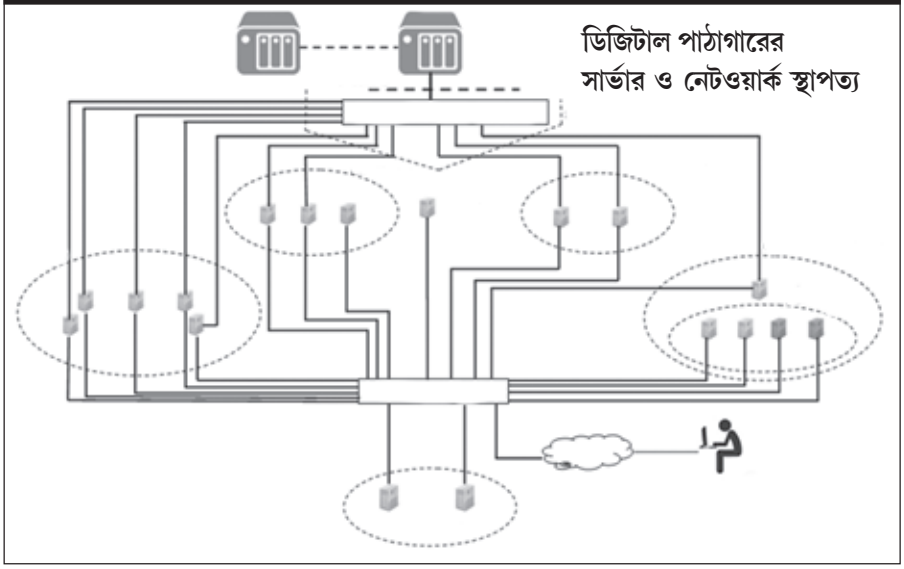

তবে এর সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, বিষয়বস্তু সংগ্রহে কার্যকর ব্যবস্থা, জাতীয় লাইসেন্সিং, পরিচ্ছন্ন কপিরাইট নীতি, স্বনির্ভর উপার্জন মডেল, মুক্ত সংস্কৃতি প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তবে আশা করা যায়, সচেতনতার প্রসার এবং বিভিন্ন মন্ত্রক ও নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় জাতীয় ডিজিটাল পাঠাগার, দেশের জাতীয় শিক্ষামঞ্চ হয়ে উঠবে।❑

[email : ppd@cse.iitkgp.ernet.in]

লেখক পরিচিতি :

★ ড. প্লাবন ভৌমিক—অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, সেন্টার ফর এডুকেশনাল টেকনোলজি, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ ড. পার্থপ্রতিম দাস—প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ ড. সুদেষ্ণা সরকার—প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ ড. অরবিন্দ গুপ্ত—প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রধান, কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স সেন্টার, IIT খড়্গপুর।
★ ড. সন্দীপ চক্রবর্তী—অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, IIT খড়্গপুর।
★ ড. বি সূত্রধর—গ্রন্থাগারিক, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়—প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং। চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ মৈনাক ঘোষ—অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং।
★ ড. অনুপম বসু—প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রধান, সেন্টার ফর এডুকেশনাল টেকনোলজি, IIT খড়্গপুর, NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।
★ নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চিফ টেকনোলজি অফিসার, NDL প্রজেক্ট।
★ ড. পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী—ডিরেক্টর IIT খড়্গপুর। প্রফেসার, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, IIT খড়্গপুর। NDL প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত।

উচ্চ মানের শিক্ষার লক্ষ্যে

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি কেবলই শ্রমের বাজারের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন? নাকি তার এক বৃহত্তর প্রেক্ষিত রয়েছে, যা প্রতিটি মানুষকে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। জরুরি এই প্রশ্ন তুলেছেন লেখক **কিরণ ভাট্টি** *এই নিবন্ধে। চটজলদি সমাধানের বদলে জোর দিয়েছেন সুস্থিত দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার ওপর।*

সাম্প্রতিককালে স্কুলে, বিশেষত সরকারি স্কুলে শিক্ষার গুণমান নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যেকোনও সমীক্ষা, তা সে ASER রিপোর্ট হোক বা NCERT-র National Achievement Survey অথবা আন্তর্জাতিক স্তরের PISA—সবেতেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে, এমনকী পড়তে পারা ও অঙ্ক কষার ক্ষেত্রেও দক্ষতা যথোপযুক্ত স্তরে পৌঁছোয়নি। মানের অবনমনের কারণ এবং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে বহু উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি ছাড়াও কথা হয়েছে শাসন নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে পরীক্ষা পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। বিভিন্ন মতামত এসেছে, কিন্তু ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়নি।

এই উত্তপ্ত বিতর্কের মাঝে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। সমাধান খোঁজার তাড়ায় আমরা কি আমাদের প্রসারিত দৃষ্টিটা হারিয়ে ফেলছি? অবহেলা করছি অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া? প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করে আমরা কি কেবল মনোযোগী হচ্ছি চটজলদি সমাধানে? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ভুলে আমরা কি প্রাধান্য দিচ্ছি অর্থনীতিকে? নতুন শিক্ষানীতির প্রাক্কালে এটাই যথার্থ সময় এগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার।

দক্ষতা অথবা শিক্ষা

শিক্ষাকে আমরা কীভাবে দেখি, সে বিষয়ে বলতে গেলে শিক্ষার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মূল্যের কথা উঠবে। বাহ্যিক দিক থেকে শিক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্তরণের সোপান, যা মাপা হয় কর্মসংস্থান ও আয়ের বৃদ্ধি দিয়ে। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে শিক্ষা হল কোনও ব্যক্তির জীবনের মানোন্নয়ন, যা সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে মাপা যায় না। দুটিই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা দেখছি শিক্ষার বাহ্যিক মূল্যের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে। স্কুল শিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে দক্ষতা উন্নয়ন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যুব সম্প্রদায়ের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের কথা না ভেবে যত দ্রুত সম্ভব তাদের শ্রমের বাজারের মূল্য তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের এই দৌড়ে শুধু যে তারা পূর্ণ শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয়, সারা জীবনের জন্যে কম মজুরির কাজে আটকে পড়ছে তারা। কাজের বাজারের জন্য দক্ষতা অর্জন শিক্ষার এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যই পূরণ করে। দক্ষতা অর্জনের জন্যও যে একটা প্রাথমিক শিক্ষার ভিত প্রয়োজন, সেই সত্যও অনেক সময়ে মানা হয় না। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এর মধ্যে দক্ষতা অর্জনের ওপর এই জোর স্কুল শিক্ষাকে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

আমরা একথা বলছি না যে, স্কুল শিক্ষা এবং একটি শিশুর জীবনে 'দক্ষতা'-র কোনও স্থান নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু তার প্রকৃতি ও ভূমিকা ভিন্ন। যেমন 'জীবন দক্ষতা' শিশুদের শিক্ষাবৃত্তের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠ্যসূচি বহির্ভূত অন্যান্য দক্ষতাও শিশুর সামগ্রিক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমস্যাটা শুরু হয়, যখন শিশুদের মধ্যে একটা ভাগকে 'জীবন শিক্ষা' এবং অন্য ভাগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে সংবিধানে বর্ণিত সাম্য ও সমান সুযোগের নীতি তো লঙ্ঘিত, হয়-ই, অর্থনীতির দীর্ঘকালীন লক্ষ্যও পূরণ করা যায় না।

বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব অথবা সামাজিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিত

বিশ্বজুড়ে স্বীকার করা হয়, জাতি গঠনে শিক্ষা অপরিহার্য। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা কী, তাই শেখানো হয় শিশুদের। পাঠ্যসূচি ছাড়াও নাগরিকত্বের মূল্য, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য—এই সবের শিক্ষা একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠার পথে প্রভাব ফেলে। এমনকী পরবর্তীকালেও তার মনে গেঁথে থাকে এই শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এখন আমরা যখন শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলি তখন কেবল বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়াবার ওপরেই জোর দিই, অবহেলিত থেকে যায় সামাজিক বিজ্ঞান। অঙ্ক ও বিজ্ঞান ভালোভাবে পড়ানোর ওপর জোর নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত, কিন্তু তাই বলে তা সমাজবিজ্ঞানকে অবহেলা করে নয়। সামাজিক বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে

একজনের মনে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং কাঠামোগত বিশ্লেষণের বোধই জন্মাবে না। বিজ্ঞান ও অঙ্কের মতোই এগুলিও একজনের শিক্ষার মৌলিক স্তম্ভ।

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অথবা চটজলদি সমাধান

শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যর্থতার দায় অনেকটাই বর্তায় নীতি রূপায়ণে বিফলতার ওপর। এর কারণ হল জনপরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সেভাবে গড়ে না ওঠা। এর জন্য অনেক কিছু দায়ী। নীতি ও পরিচালন প্রক্রিয়া, (নিয়োগ, পরিকল্পনা ও নজরদারি) অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় ভারসাম্যের অভাব (সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়, যোগাযোগের প্রবাহ, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো) বৃহত্তর কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বেসরকারি পক্ষের সম্পর্ক, গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। সমন্বয়ের এই অভাব স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চতম প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত ছায়া ফেলে। আজ শিক্ষাব্যবস্থার 'সংকটের' জন্য এটিই অনেকাংশে দায়ী। আমি সচেতনভাবেই 'সংকট' শব্দটা ব্যবহার করছি। এর ফলে শোরগোল উঠতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নীরব উপেক্ষার থেকে শোরগোল ওঠাটা অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বদলে আমরা ভান করি যেন কোথাও কোনও সমস্যা নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসনসংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়ে না। তার বদলে প্রযুক্তির হাত ধরে চটজলদি সমাধানের খোঁজ চলে। অনেক সময়ে যেখানে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে, যেখানকার প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনগত কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাও থাকে না। ফলে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকুও করা হয় না। যেমন—কম্পিউটার শিক্ষা যেখানে আদৌ পৌঁছোয়নি, সেখানে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান খোঁজা একদমই বাস্তবসম্মত নয়। অথচ সেই সব জায়গার স্কুলে কম্পিউটার দিয়ে দেওয়া হল। সেগুলি তালাবন্ধ ঘরে পড়ে থেকে নষ্ট হয়। স্কুলের বাজেটে বিদ্যুৎ বিল মেটানোর সংস্থান না থাকায় শিক্ষককে নিজের পকেট থেকে টাকা দিতে হয়। নিয়োগের শর্ত অথবা কাজের পরিধির সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাযুজ্য না থাকায় অনেক সময়েই হতাশায় ভোগেন শিক্ষকরা। তাই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা না হলে দীর্ঘমেয়াদি ফল পাওয়া মুশকিল। এমনকী শিক্ষকদের দায়বদ্ধতাকেও সার্বিক প্রক্রিয়া ও স্বশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। টুকরো টুকরো সমাধান, নিষ্পত্তির বদলে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে।

নজরদারি, পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন নিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় কথা খুব একটা হয় না। পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণকে উদ্দেশ্য হিসাবে রাখা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ বিশেষ হবে না। স্থানীয় স্তরের কথা না শুনেই উচ্চতর স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নজরদারি ব্যবস্থা থেকে প্রতিক্রিয়া পৌঁছোয় না পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের কাছে। বহু গাফিলতি রয়েছে তথা সরবরাহ ব্যবস্থায়। তথ্যের পাহাড় জমলেও কার্যক্ষেত্রে তার ব্যবহার হয় না। সুচারু তথ্যজ্ঞাপন ব্যবস্থার আয়োজন করা গেলে তা পরিকল্পনা, তার রূপায়ণ, নজরদারি—সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রশাসক, শিক্ষক ও স্থানীয় মানুষজন—সকলেই নিজেকে স্কুলের অংশীদার হিসেবে ভাববেন।

স্থানীয় মানুষজনের অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণের মতো বিষয়গুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই ভাবা হচ্ছে। কিন্তু এর রূপায়ণ সেভাবে হয়নি। আগের কাঠামোর সমস্যাগুলি দূর না করেই সমান্তরাল কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। PTA, MTA, VEC, SDMC, SMC গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এগুলির ক্ষমতার পরিবর্তন করা হয়নি। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় এগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ আর্থিক ও মানবসম্পদ বিনিয়োগ করা হয় তাহলে অবস্থাটা পালটাবে।

উপসংহার

প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর জন্য দূরদৃষ্টি ও একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। চটজলদি ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত চমকে এই কাজ সম্ভব নয়। এর জন্য সার্বিক প্রক্রিয়ার ভিত মজবুত করতে হবে, প্রশস্ত করতে হবে সুস্থিত দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথ। আমরা এতে সফল না হলে আগামী প্রজন্মও থেকে যাবে শিক্ষার সুযোগ ও উন্নয়নের প্রান্তিকতায়।

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।❑

[লেখক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফেলো। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়ে কর্মরত। এর আগে UNICEF-এ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত।
email : kiranbhatty@gmail.com]

বি। শে। ষ। নি। ব। ন্ধ

ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ হল সব ধরনের শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা—আর সেটা মূলস্রোতের স্কুলে অবশ্যই থাকা দরকার। বিদ্যালয় শিক্ষার জাতীয় পাঠ্যসূচি কাঠামো (এনসিইআরটি ২০০৫) বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা যেসব শিক্ষার্থীর রয়েছে, তাদের জন্য সর্বোপযোগী বিদ্যালয় গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে। বর্তমান নিবন্ধে লেখক **ড. অনুপ্রিয়া চাচা** *ওই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।*

সব ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে 'সকলকে শামিল করে শিক্ষা' হল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ করে যাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, তাদের সামনের বাধাগুলি কাটানোর ক্ষেত্রে এটা বিশেষ জরুরি। এর উদ্দেশ্য হল নবীন বয়সের সব শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধকতা-সহ অথবা তাছাড়া, যাই হোক না কেন, সকলেই যেন একসঙ্গে শিখতে পারে অভিন্ন প্রাক্-বিদ্যালয় সংস্থান, বিদ্যালয় এবং গোষ্ঠীগত শিক্ষামূলক ব্যবস্থায়, যেখানে সহায়ক পরিষেবার উপযুক্ত নেটওয়ার্ক রয়েছে। এটা একমাত্র কোনও নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সম্ভব, যেটা বহু ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলির সম্মিলন ঘটায় এবং নিজেকে ওই সব চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে তোলে। সকলকে শামিল করে শিক্ষা তাই সকলের জন্য মৌলিক মানবাধিকার ও মানবাধিকার অর্জন, এমনকী যাদের শারীরিক অনুভূতিগত, বৌদ্ধিক বা অবস্থাগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদেরও এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার সব পর্যায়ে সকলকে শামিল করার নীতি ও পদ্ধতি, মূল্যবোধ, জ্ঞানার্জন ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি প্রক্রিয়া এবং গঠন—এই সবের মাধ্যমে। বিদ্যালয় শিক্ষার জাতীয় পাঠ্যসূচি কাঠামো (এনসিইআরটি ২০০৫) বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা যেসব শিক্ষার্থীর রয়েছে, তাদের জন্য সর্বোপযোগী বিদ্যালয় গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়, উপস্থাপনা এবং বিনিময়গত কৌশলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে, সেই সঙ্গেই শিক্ষকদেরও তৈরি করতে হবে আর অনুকূল মূল্যায়ন পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করা যায়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে তলিয়ে দেখা

এই আলোকে যেসব চর্চা ও তাত্ত্বিক ধারণা আরও বেশি সার্বজনিক শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টির গতিকে উৎসাহিত বা ব্যাহত করে সেগুলি খতিয়ে বা খুঁজে দেখাটা বিশেষ জরুরি। লেখাপড়াটাকে কেবলমাত্র প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখে উৎপাদন রূপে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বর্তমানে জোর দেওয়া হয় : যার দরুন একটা আপাত গ্রাহ্য পুরস্কার হিসেবে ধরা হয় শিক্ষাবর্ষের শেষে দেওয়া রিপোর্ট বা মার্কশিট বা ডিগ্রিকে সেটা এরই ফল। শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক লক্ষ্যকে পুনর্গঠনের আশু প্রয়োজন রয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করার লক্ষ্যটুকু হারিয়ে না যায়। ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে শিক্ষালাভে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের মধ্যেই কিছু ভুল আছে বলে ধরে নেওয়ার ইচ্ছেটা বড় বেশি সহজগ্রাহ্য বলে মনে হয়। শিক্ষাব্যবস্থার আত্মসমীক্ষার সময় হয়েছে।

এই সার্বজনিক শিক্ষার ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জটা হল এই যে আমাদের এমন ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে, যেখানে—

- প্রত্যেকে সেই স্কুলের হবে, স্কুলে গৃহীত হবে, সমর্থিত হবে এবং তার নিজের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হবে।
- বিদ্যালয়গোষ্ঠীর শীর্ষ শ্রেণির এবং অন্য সদস্যরাও শিক্ষা গ্রহণকালে সহায়তা করবে।
- তার শিক্ষাগত চাহিদার পূরণ ঘটবে।

সনাতন শ্রেণিকক্ষ হল এমন একটি জায়গা যেখানে শিক্ষাদান সংক্রান্ত, শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত তৎপরতা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে বলে আশা করা হয়, যেখানে মূল্যায়নগুলি হয় কেবল উত্তরপত্রের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার মাধ্যমে এবং সেই সব কাজের মাধ্যমে যেগুলি সহজে ও দ্রুত মূল্যায়ন করা যায় এবং করে ফেলা সহজ, আর, সেইগুলির সম্পর্কে সব সিদ্ধান্তই কেবল প্রাপ্তবয়স্করাই নিয়ে থাকেন। প্রায়শ শিক্ষাদানের পদ্ধতি হল শিক্ষকদের ভাষণদান অথবা শিক্ষার্থীদের কিছু করতে দেওয়া। এই ধরনের শ্রেণিকক্ষের খুব সহজ প্রতীক হিসেবে উপমা দিতে গিয়ে বলা যায় যে এখানে শিক্ষার্থীরা হল সেই সব পাত্র যেটিকে শিক্ষক প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বারা পূরণ করবেন। অপরদিকে সার্বজনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ হল একটা পরিবেশ, যার মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্কুলের মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীগোষ্ঠীকে সহায়তা ও পথনির্দেশ জোগায় আর যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে মিলেই পাঠক্রমকে আবিষ্কার করতে পারে এবং নানা ধরনের ক্ষমতায় পারঙ্গমদের অবদানে সুফল লাভ করতে পারে। যেসব শিক্ষক সবাইকে শামিল করতে চান, তাঁরা ধারাবাহিকভাবে বদ্ধ ধারণা, পাঠ্যবই এবং ভিত্তি সংক্রান্ত অভ্যাস তাড়িত শিক্ষাদান থেকে সরে এসে সহযোগিতাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের দিকে দৃষ্টি দেন ও বিষয়গত পাঠ নির্দেশ, গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, সমস্যার সমাধান এবং প্রকৃত মূল্যায়নের দিকে নজর দেন।

চাহিদার বৈচিত্র নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্ঞানার্জন এবং সামাজিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটা একটা সুযোগও বটে : ব্যক্তিগত সমস্যার বদলে বরং গোটা ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অধ্যাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ানোর অর্থ হল ব্যবস্থাটি এবং স্কুলের সংস্কার করা। শ্রেণিকক্ষের কাজকর্মের এমনভাবে পুনর্গঠন করা যাতে সব শিক্ষার্থী সুযোগ পাওয়ামাত্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এবং সব শিক্ষকরাই তাদের গঠনমূলক দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদি সকলকে শামিল করে শিক্ষাকে সত্যি সত্যি সকলের জন্য শিক্ষার এক ত্বরান্বিত কৃতিত্বের প্রতি অবদান রাখতে

হয় তাহলে নতুন নতুন চাহিদা, চ্যালেঞ্জ, সমস্যা, দ্বিধা এবং টেনশন যা কিনা এই পরিবর্তনের ফলে দেখা দেবে তার হিসেব নেওয়াটা বিশেষ জরুরি।

বিদ্যালয়গুলিকে সামাজিক একতার এক প্রধান অঙ্গন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যেখানে তরুণ নাগরিককে তৈরি করে নেওয়া হয়। সেই দিক থেকে সকলকে শামিল করাটা এবং আরও সহনশীল, সুসভ্য ও বহুত্ববাদী এক বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলাটাই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সমাধান হতে পারে। স্কুলগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য একদিকে যেমন জটিল আর অন্যদিকে তেমনি সমস্যার। কেননা এগুলি একই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত এবং ওই সংস্কৃতিকে পরিবর্তনের উপযোগী জটিল ও দ্বন্দ্বমূলক। সেই জন্যই সকলকে শামিল করে শিক্ষার যে কোনও আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তার মধ্যে জড়িয়ে নেওয়াটা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতা শিক্ষাদানের একটি সমৃদ্ধ উৎস। বড়দের শেখানো এবং বড়দের সঙ্গে সহযোগিতা ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জনের একটা উৎস হিসেবে কাজ করতে প্রেরণা জোগায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাবা-মার-ই নিজের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে আর এটা বিশেষ করে সেইসব ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়সিদের যাদের জ্ঞানার্জনটা বিশেষ করে উদ্বেগের জায়গা, আরও বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থীরা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে সব গোষ্ঠীর মধ্যেই জ্ঞানার্জনের সুযোগ রয়েছে, যাকে শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে পারে।

সামনের পথ

সকলকে শামিল করাটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক দর্শন হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পেশাদার-ই যে ব্যাপারে কিছু না কিছু সহমত পোষণ করেন, সেটা হল অনুশীলন বা চর্চাটা এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে এবং অবশ্যই এক শিক্ষক থেকে আরেক শিক্ষকে অনেকটাই আলাদা হয়ে যায়। যদিও এমন কোনও পরিকল্পনা থাকতে পারে না যেটা সবার ক্ষেত্রেই মান্য, কিন্তু এমন কিছু শিক্ষণ কৌশল অবশ্যই রয়েছে, যেটা সাধারণ শিক্ষামূলক শ্রেণিকক্ষের সব

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, সামাজিক এবং পাঠদান সংক্রান্ত চাহিদা মেটায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রয়োজনীয় কেননা এর ফলে সকলকে শামিল করে শিক্ষাটা তাত্ত্বিক এবং মূল্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক অনুশীলনের দিকে এগোয়।

শামিল করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেন বৈচিত্রের সংস্থান থাকে

সকলকে শামিল করার সাফল্যটা নির্ভর করে শ্রেণি শিক্ষকদের ওপর কেননা তিনিই হলেন শিক্ষাগত পরিবর্তন এবং স্কুলের মানোন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবের কাঠামোর মধ্যে ঘোষিত নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনিই থাকেন সম্মুখভাগে। এজন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের দরকার হয়, যার দ্বারা এই গোষ্ঠীর সব সদস্যকেই যেন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই মূল্য দেওয়া হয়। শিক্ষকদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে সব ধরনের ছাত্ররাই জ্ঞানার্জনে সক্ষম এবং সেই অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শিক্ষকরা যেন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে চিনে নিতে, গ্রহণ করতে এবং তাদের উৎসাহ দিতে থাকেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ তাদের পার্থক্যটা মেনে নিয়েই সমদর্শিতার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তাই যে কোনও সমদর্শী শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী শিক্ষার জন্য এমন শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজন যেটা নানা ধরনের পশ্চাদপদ, চাহিদা ও গুরুত্ব সংবলিত শিক্ষার্থীদের একত্রিত করতে পারে। এই কৌশলগুলি আমার মতে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দেয়।

- শিক্ষার প্রসঙ্গ
- শিক্ষার বিষয়বস্তু
- শিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া।

■ **শিক্ষার প্রসঙ্গ :** সার্বজনিক অন্তর্ভুক্তিকে যদি অংশগ্রহণ বাড়ানোর এবং প্রতিবন্ধকতা কমানোর বা সরিয়ে দেওয়ার দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। যেটা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন এবং অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তোলে, তাহলে শিক্ষার প্রসঙ্গ অর্জনের পরিকল্পনাটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে শুধু যে পরিবেশগত উন্নতি বিধানের ব্যাপারটি রয়েছে (অর্থাৎ কিনা সংস্থানগত ব্যবস্থাপনা, শ্রেণিকক্ষের উন্নতি সাধন অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে মাউন্টেড রেলিং-এর ব্যবস্থা করা, হুইল চেয়ার ঢোকার জন্য মেঝের পরিসরকে নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত করা ইত্যাদি) তা নয়। তবে এছাড়াও মূল স্রোতের বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের কঠোর শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেক্ষেত্রে কেতাবি পারঙ্গমতার পরিমাপটাই কেবল একমাত্র বিচার্য। কিন্তু সার্বজনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক

ব্যবস্থায় যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধতার মহান বোধ ও আস্থা বিরাজ করে। বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েরা যারা সহযোগিতার একই পরিবেশে থাকে, তাদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধতার বিরাট বোধ ও আস্থা বিদ্যমান প্রতিযোগিতার বদলে কেননা অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিকল্পিত এই পরিবেশের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক উপকরণ ও অভিজ্ঞতা দুয়েরই সংস্থান ঘটানো হয়েছে, যেটা সব ধরনের ছেলেমেয়েদেরই জন্য অত্যাবশ্যক।

সামাজিক দক্ষতা এবং সতীর্থদের সঙ্গে সম্পর্কটা যে পুঁথিগত কৃতিত্বের সমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি দরকারি, সেই ধারণাটা সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে যত ভালোভাবে মেনে নেওয়া হয়, সেটাই বিশেষ প্রয়োজন। মূল স্রোতের বিদ্যালয়গুলিতে একটি আস্থা এবং সতীর্থদের মধ্যে আলাপচারিতামূলক পরিবেশ গড়ার জন্য সহযোগিতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের জন্য দল গঠন করা অত্যন্ত কার্যকরী এক শিক্ষণ কৌশল।

এই ধরনের সহযোগিতাভিত্তিক শিক্ষার্থীর দলের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যে শুধু একে অপরকে পড়া বুঝিয়ে দেয় তাই নয়, অভিজ্ঞতা ভাগ করেও নেয়, নানা ধরনের প্রেক্ষাপট ও পারস্পরিক সমর্থন জোগায়। দল গঠনটা জুটি বাধার মতোই বিভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের দু'জনের গ্রুপে অথবা মিশ্র সামর্থ্যসম্পন্ন বড় বড় দলে ভাগ করে দেওয়া যায় এবং প্রত্যেক সদস্যের সেখানে ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে যেমন কি না সময়রক্ষক, উপস্থাপক ইত্যাদি। এইভাবে সহযোগিতাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের ফলে শ্রেণিকক্ষগুলি এমন প্রতিযোগিতার জায়গা হয়ে ওঠে না, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রমাণ করতে এবং ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে বরং এমন পরিবেশ গড়ে ওঠে যেখানে ছাত্ররা পরস্পরকে সহায়তা করে এবং একে অপরের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে।

■ **শিক্ষার বিষয়বস্তু :** উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাদানের লক্ষ্য প্রায়শই বাস্তবিক হওয়ার বদলে আদর্শে পরিণত হয়। শিক্ষকরা কার্যকরী মানের শিক্ষাদানের জন্য যেভাবে লড়তে থাকেন, তার পরিণামেই এই ব্যাপারটা হয়। পড়ানোটা এই পর্যন্ত মূলত গড় মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

যার অর্থ পড়ানোর সঙ্গে একদিকে যেমন কিছু ছাত্রছাত্রী তাল রাখতে পারে না, অন্যদিকে তখন বাকিরা পড়ানোটাকে 'বড় বেশি সহজ' বলে মনে করতে থাকে এবং তাদের কাছে এটা একঘেয়ে লাগে। ক্লাসে নানা ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠদানের পরিকল্পনা অবশ্যই নেওয়া দরকার। প্রতিটি শিক্ষার্থী-ই অনন্য জ্ঞানার্জনমূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রযুক্ত ক্লাসে নানা ধরনের শিক্ষার বিকল্প দেখা যায়, যেগুলি বিভিন্ন মাত্রার প্রস্তুতিকে নির্দেশ করে, আর তার ফলে বিভিন্ন ধরনের সংস্থানের প্রয়োজন হয় যেমন :

★ পাঠক্রমের বিষয়টিকে খুঁজে নিতে ছাত্রদের জন্য নানা উপায়ের ব্যবস্থা করা,

★ নানা ধরনের সক্রিয়তার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ছাত্ররা বুঝতে পারবে এবং তথ্য ও ধারণাগুলিকে আপন করে নিতে পারবে।

★ এমন সব বিকল্প যার মাধ্যমে ছাত্ররা, তারা কী শিখল তা তুলে ধরতে পারবে (উদাহরণস্বরূপ কাঙ্ক্ষিত উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়ার ধরন উদ্ভাবন করা যা কি না ছাত্রদের কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি লিখিত/মৌখিক/বা বৈকল্পিক অনুবর্ধনমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের দ্বারা অর্জিত)।

যে কোনও শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের নানা ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠদানের প্রক্রিয়ার ওপরে যেসব পদ্ধতি আলোকপাত করে সেগুলিকে কোনও একটিমাত্র সুপারিশ করা পাঠ পাঠ্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে শিক্ষকদের রদবদল ঘটানোর সুযোগ দিতে হবে। যেমন কি না জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য এবং পাঠদানের গতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নমনীয়তা আনার সুযোগ দিতে হবে। যে সমস্ত পাঠদান পদ্ধতি ধারণার উপর কেন্দ্রীভূত এবং অনুশীলনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতির দ্বারা পরিচালিত (প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষের গৃহীত পদক্ষেপ বা দক্ষতার বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় নানা ব্যাখ্যা-সহ) যার ফলে শুধু যে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ছেলেমেয়েরা উপকৃত হয়, তা নয় ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদেরও ধার্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুবিধা হয়।

■ **শিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অর্থ কেবল এটা হতে পারে না যে স্রেফ সব ধরনের ছেলেমেয়েদের সাধারণ শ্রেণিকক্ষে একত্রে বসিয়ে আগে থেকে নির্ধারিত তথ্যাদি গিলিয়ে দেওয়া হবে। জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াটা হল প্রত্যক্ষ, আদৌ পরোক্ষ নয়। এর রূপান্তর ঘটাতে হবে এবং এর জন্য দরকার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কোনও অন্তর্ভুক্তিমূলক সার্বজনিক শিক্ষার ক্লাসে নানা ধরনের তৎপরতা প্রায়শ একই সঙ্গে ঘটতে থাকবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকেও শিক্ষককেন্দ্রিকতা থেকে সরে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে হবে। শিক্ষার্থীদের সেইজন্যই আবেশমূলক চিন্তার প্রক্রিয়াকে

উৎসাহ জোগানোটা এক্ষেত্রে খুব উপযোগী শিক্ষাদান কৌশল হয়ে উঠবে।

এই কৌশলের সদ্ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের উচিত হবে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং আবিষ্কারমূলক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সহায়তা জোগানো। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় পর্ষদ, এনসিইআরটি সাম্প্রতিককালে পাঠক্রমের অভিযোজন সংক্রান্ত আদর্শ উপকরণ তৈরি করেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সার্বজনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কীভাবে নমনীয়তা প্রয়োগ করা যায় সেগুলি। এই সব উপকরণ এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেখানে শিক্ষক সমস্ত ছেলেমেয়েকে জ্ঞানার্জনের অর্থবহ অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং নিতান্ত সরল ভাষা ও ভাব ব্যবহার করে সমস্ত ছেলেমেয়ের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই উপকরণের মধ্যে নানা ধরনের উদাহরণ রয়েছে, যেটা দেখিয়ে দিচ্ছে কী করে সার্বজনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে বর্তমান শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পালটে ফেলতে হবে এবং যাতে শিক্ষার্থীরা অনপেক্ষভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই উদাহরণমূলক উপকরণের সাহায্যে সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় থাকা এক লক্ষ আটান্ন হাজার মূল স্রোতের শিক্ষককে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ : শিক্ষকের সামর্থ্য গড়ে তোলা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিকাশ শুধু যে শিক্ষকের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত দক্ষতা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে চলে তাই নয়। যাদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার জন্য যারা দায়ী তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আনে। এই বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিক্ষাক্ষেত্রের সব কর্মীদের জন্য পেশাগত উন্নয়নের এক সংসক্তিমূলক কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই বিরাট পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে শিক্ষকই প্রাথমিক ভূমিকা নেবেন। তাই

বাস্তবে সযত্নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টা বাস্তবে পরিণত হয়। যদিও শিক্ষাদানকারীরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরও বেশি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষণে ব্যবহৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া তার বিরোধিতা করতে পারে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদাতাদের এক্ষেত্রে বোঝানো সম্ভব নাও হতে পারে। বহু শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে অ্যাড-অন-মডিউল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যেগুলি সাধারণত প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই জড়িত অথবা যাদের বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা রয়েছে বলে মার্কা করে দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্যই কেবল সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য সমস্ত ধরনের পাঠক্রমের ক্ষেত্রে নয়। এইভাবে লিঙ্গ, জাতিগত বৈচিত্র, ভাষাগত পার্থক্যকে নীরবে সরিয়ে দেওয়া হয়। অবিলম্বে এক গতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠক্রম তৈরির পথ সুগম করার লক্ষ্যে সাধারণ এবং বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠক্রমগুলির প্রতিফলন ও আত্মসমীক্ষণ বিশেষ জরুরি।

ধারাবাহিক এবং পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন (সিসিই)-এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি এই লক্ষ্যেই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। সিসিই ছাত্রছাত্রীদের স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমন এক মূল্যায়নের কথা বলে যেটা শিক্ষার্থীদের বিকাশের সমস্ত দিক জুড়ে থাকে। এটা দুরকম উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেয়। এই উদ্দেশ্যগুলি হল মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা এবং শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়ার সব দিকের মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের বিকাশ ও উন্নয়নে চিহ্নিত দিকগুলির মূল্যায়ন হল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পর গৃহীত একটি বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষা মাত্র নয়। দ্বিতীয় আখ্যা 'পূর্ণাঙ্গ' বলতে বোঝায় যে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের বিকাশ ও উন্নয়নে মেধাগত ও অন্যগুলির সবকটিকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাদান করাটা তাই অবশ্যই সফল হবে যদি অধ্যাপনামূলক দিক থেকে এটা সমদর্শী হয় এবং শিক্ষাদানের জন্য আনা সব শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তির ওপরই জোর দেওয়া হয় : শিক্ষাদান করা হয় প্রশ্ন করা, গবেষণা, সহযোগিতামূলক শিক্ষা, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে—এ সবকটাকেই 'সেরা অনুশীলন' সংক্রান্ত পরিভাষার মধ্যে সাধারণভাবে এনে ফেলা হয়েছে। স্কুলে প্রতিটি শিশুকে পাঠক্রম, পাঠ্যবই এবং জ্ঞানার্জনকারী বস্তুসমূহ জুগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পাঠক্রম, পাঠ্যবই এবং শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণে একই রকম প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করার দরকার। এইভাবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।❑

[লেখক সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মুখ্য পরামর্শদাতা।

email : iedtsgssa@gmail.com]

নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা ও বর্তমান ভারত

নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা, নারীমুক্তি, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষি ও শিল্পভাবনা, সাংস্কৃতিক ভাবনা, শিশু ও অসহায়দের ব্যাপারে পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা, প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক ও কর্তব্য সংক্রান্ত তাঁর ভাবনা—এ সব বিষয় নিয়ে চর্চা হয়েছে কতটুকু? **ড. জয়ন্ত চৌধুরী** *নেতাজির আর্থ-সামাজিক ভাবনা এবং বর্তমান ভারতে তার প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোকপাত করছেন এই নিবন্ধে।*

নেতা-জি—তিন অক্ষরের একটি নাম, একটি মন্ত্রের মতো যা দেশপ্রেমিক হৃদয়ে ঝড় তোলে। মা-ডাকের মতোই শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের আচ্ছন্ন করে এই ডাকটি। মহাবিশ্বের অনেক নক্ষত্রের ভিড়ে সূর্যের স্থান অনন্য। আলো আঁধারের জোয়ারভাটায় হারিয়ে যাননি তিনি। ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁকে নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গুরুত্ব দিচ্ছে তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় সত্য প্রকাশ্যে আনার ব্যাপারে। কারণ তিনি সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়েও চিন্তাভাবনায় সর্বোপরি দেশের মুক্তি সাধনায় পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক। তাঁর চোখে স্বাধীনতার অর্থ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। কৈশোরে যখন হিমালয়ের টানে, সন্ন্যাসের আহ্বানে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে বন্ধুকে নিয়ে সবার অগোচরে ঘর ছেড়েছিলেন তখন প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতপাত দীর্ণ পরাধীন ভারতের রূপ। কাশী রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ব্রহ্মানন্দের পরামর্শে বৃহত্তর মানবমুক্তির লক্ষ্যে সে বার তিনি ঘরে ফিরে এসেছিলেন। সুহৃদদের জানিয়ে ছিলেন অভিজ্ঞতার কথা, যার মূল ভাবনাই ছিল পরাধীনতা শুধু রাজনৈতিক দাসত্বের সৃষ্টি করে না মানসিক

চিত্র-১ : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস

ভাবেও সংকীর্ণ করে তোলে।

আইসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের পর বন্ধুকে লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন মান সম্মান যশ প্রতিপত্তি এসব তার জন্য নয়, সাগরের ঊর্মিমালার স্রোতে সংগ্রামময় জীবনই তাঁর কাম্য। স্বাধীনতাপিয়াসী সুভাষচন্দ্র আর এক সন্ন্যাসী যোদ্ধা মানব প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের মতো চিন্তা চেতনায় পোষণ করতেন—'Freedom, Freedom is the song my soul'.

১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবের ডালহৌসি থেকে বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন—'জীবন অন্তহীন সংঘাত। সমস্ত আবেগ জয় না করা পর্যন্ত কোনও শান্তি নেই, কিন্তু সংগ্রাম করতে করতে ধীরে ধীরে আনন্দ লাভ হয়, গভীর সন্তোষ ও আত্মবিশ্বাস আসে।'

সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন', 'ভারতের মুক্তিসংগ্রাম' কিংবা অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' বইগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এক অসামান্য মনীষাদৃপ্ত বিপ্লবী হৃদয়ের ভাব ও ভাবনা। যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতির প্রেক্ষিত এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন সাধনের সংগ্রামময় জীবন দর্শনের পাশাপাশি আগামী পথ চলার অভিমুখ। তিনি যখন বাংলার রাজনীতিতে, তিনি যখন সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় দু'বারের নির্বাচিত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে স্বীকৃত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কমান্ডার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে পাওয়া গেছে 'জনগণমন ভারত ভাগ্য বিধাতার' প্রতিভূ রূপে। যদিও তাঁর অখণ্ড ভারতভূমি ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে অখণ্ড থাকেনি, তিনিও নির্মম ভাবে উপেক্ষিত থেকেছেন, তবু তিনি কিছু মৌলিক ভাবনা

চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিশ্বময় কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার মধ্যেও যা আগামীদিনের পথের দিশারি হতে পারে। নানা বক্তৃতায়, লেখায় তিনি আগামী ভারতের রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন বারংবার।

তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনা, নারীমুক্তি, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষি ও শিল্পভাবনা, সাংস্কৃতিক ভাবনা, শিশু ও অসহায়দের ব্যাপারে পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা, প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্তমান ভারতের প্রেক্ষিতে গবেষণা ও চর্চার দাবি রাখে।

তিনি ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির আঘাতে কলকাতার রাজপথে রক্তাক্ত হয়েছেন, এগারোবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, হয়েছেন নির্বাসিত। অসরকারি রাষ্ট্রদূতের মতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনসংযোগের পাশাপাশি স্বাধীনতার লক্ষ্যে ভারতের প্রকৃতচিত্র, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অব্যবস্থা তুলে ধরেছেন নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও। তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপি বই প্রকাশের আগেই ব্রিটিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। তাঁর পক্ষে সুযোগ হয়নি কোনও প্রাসাদে বন্দি জীবন কাটানোর অবসরে বই লেখার, তবু তিনি ভারতকে ভালোবেসে তাঁর 'ডিভাইন মাদার ল্যান্ড'-কে মুক্ত করতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যা একটা পরাধীন জাতির প্রতিনিধিদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব ছিল। তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে হরিপুরায় তিনি বলেছিলেন—'আমরা শুধু ভারতের জন্যই সংগ্রাম করছি না, সমগ্র মানব জাতির জন্যই আমাদের সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ মানব জাতির মুক্তি' (''India freed means humanity saved'').

বিদেশে বিশেষ করে কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পারস্য, আফগানিস্তান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশে ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্বের কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। চেয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে একযোগে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আদান প্রদান। বিদেশে ভারতের প্রতি যত সহানুভূতিশীল, যত সহযোগী ও আগ্রহী করে তোলা যায় ততই ভারতের ও আন্তর্জাতিকতার কল্যাণ হবে বলে তিনি মনে করতেন। ১৯৩৫ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ভারতীয় প্রচার কেমন হবে তা তিনি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন—

১) ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার খণ্ডন;

২) ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে পৃথিবীকে জানানো;

৩) মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে ভারত যে উন্নতি করেছে জগৎবাসীকে তার পরিচয় দান;

তাঁর মতে এই আন্তর্জাতিক প্রচারের উপায়গুলি হচ্ছে—

১) ভারতবাসী সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবে

২) বিদেশি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ভারত সম্বন্ধে রচনা থাকবে

৩) বিদেশি নানান ভাষায় ভারত সম্পর্কে বই প্রকাশ করতে হবে

৪) ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় সাহিত্যের এক একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার খুলতে হবে।

৫) আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচারের জন্য উপযুক্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়মিতভাবে বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকবে।

৬) বিদেশে ভারতীয় ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী করতে হবে।

৭) ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

৮) ভারত ও বিদেশি পণ্ডিতদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং বিদেশি পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে ভারতে।

৯) ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যও বিদেশে যুক্তসংঘ গড়ে তোলা যেতে পারে।

১০) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের জন্য কাজ করছে তাদের সাহায্য করতে হবে।[১]

সুভাষচন্দ্রের এমন দিক নির্দেশ আধুনিক বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যেই কম বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে নেতাজি গ্রেটার ইস্ট এশিয়া অ্যাসেমব্লিতে বলেছিলেন—'We have learnt to distinguish between false internationalism and true internationalism. Internationalism is true which does not ignore nationalism but is rooted in it.' উল্লেখ্য তিনি নানা রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে একদা বলেছিলেন যে কোনও কোনও 'ism'-এর সমর্থকরা মনে করেন যে সেই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বে স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে কিন্তু যতক্ষণ না আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল অর্জন করতে পারছি ততক্ষণ কোনও মতবাদই কার্যকর হতে পারে না। এমন বাস্তবোচিত বলিষ্ঠ বক্তব্য সুভাষচন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন তা আজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ও বিশ্বরাজনীতির দর্পণে সত্য বলে বারংবার প্রমাণিত। তরুণ সুভাষচন্দ্র তাঁর মথুরা ভাষণে (মে, ১৯৩১) ডাক দিয়েছিলেন—'আমাদের সম্মিলিত জীবনের ভিত্তি হবে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম। ...মানুষের জন্য প্রেমানুভূতিতে উদ্দীপিত না হলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারব না, সব মানুষকে সমান বলে ভাবতে পারব না, স্বাধীনতার জন্য কষ্ট সহ্য করতে ও ত্যাগ করতে পারব না এবং সঠিক শৃঙ্খলার প্রবর্তন

করতে পারব না,...' আজকের ভারতেও তাঁর সেদিনের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা যায়।[২]

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৩১ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে যে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ অভাব-অভিযোগ ও দাবি তিনি উত্থাপন ও আলোচনা করেছিলেন তা আজও যে কোনও মঙ্গলকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম সূচক হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ায় বা এস এম এস ভাষায় সারা দেশ জুড়ে ভাব আদান-প্রদানের অবাধ গতি লক্ষ করা যায় সুভাষচন্দ্র বহু বছর আগে রোমান হরফে হিন্দি উর্দুর মিশ্রণে হিন্দুস্থানি ভাষায় ভারতের ভাষা সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা ও নতুন ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এই নিয়ে ১৯২৮ সালে 'ইন্ডিপেনডেন্স লিগ অব ইন্ডিয়া'-র বাংলা শাখার ইশতেহার তিনি লিখেছিলেন সেই কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র (শিল্প, কৃষি), রাজনৈতিক গণতন্ত্র (পূর্ণ স্বাধীনতা), সামাজিক গণতন্ত্র (বর্ণপ্রথা, নারীমুক্তি, বিবাহ পৌরোহিত্য) ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

১৯২৪ সালে তরুণ সুভাষচন্দ্র 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। একটি সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন—'আমাদের সমাজে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই। এক কথায় পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতা ভোগ করছে নারীকেও আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেখতে চাই।' তিনি একটি সভায় বলেছিলেন—"...সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি? জননীকে ভালোবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়—সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালোবাসা।..." আজাদ হিন্দ সরকারের নানা প্রকাশনা, বুলেটিনে এমন নানা ভাবনা-চিন্তা লক্ষ করা গেছে।

নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার লক্ষ্যে তাঁর চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী লীলা নাগ, লতিকা বসু সহ বহু বিদুষী কন্যা এগিয়ে এসেছিলেন নানা বিদ্যালয়, সংগঠন স্থাপনের মাধ্যমে। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। ঝাঁসিরানি ব্রিগেড সম্ভবত পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর যখন প্রথম মহিলারা সামরিক বাহিনীতে ঢোকার সুযোগ পেলেন তাঁর আগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে সামরিক পোশাকে কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়ে বুকের রক্তে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শুধু নারী নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরুষ পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের অংশ গ্রহণ ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

স্বাধীন ভারতের যোজনা আয়োগ সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির উত্তরসূরি হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে। পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পেলে দ্রুত জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে স্বাধীন ভারত তাঁকে স্বীকৃতি দিক আর নাই দিক, তাঁর দেখানো পথেই এসেছে ভারতের জাতীয় সংগীত কিংবা বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক পুরস্কার প্রদানের নীতি ও রীতি।

ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির পাশাপাশি ১৯৪০ সালের ৮ মে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিতে 'ন্যাশনাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি যা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারাই সম্ভব এমন ভাবনার ভিত্তিতেই ওই বোর্ড গড়ে ওঠে। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ও পরিকল্পনা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপগুলির কথা বলা হয়েছে—

১) জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে মরা বা মজা নদী ও খালের সংস্কার, কোথাও সেচের জল সরবরাহের জন্য, কোথাও বা জমা জল নিকাশের জন্য নতুন জলপথের সৃষ্টি; উপযুক্ত সার সরবরাহ, চাষের জমি এবং নানা প্রকার কৃষিজ উৎপাদনের উন্নতির জন্য প্রয়াস।

২) খেতের উৎপাদনের সর্বাধিক ফল যাতে কৃষক লাভ করে তার ব্যবস্থা করা।

৩) আইনের দ্বারা চাষের জমি আরও টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া রদ করা; কারও অধিকারে বাড়তি জমি থাকলে তা নিম্নমানের জমির মালিকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

৪) চাষের জন্য সরকারি ঋণদানের ব্যবস্থা করা।

৫) প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় সমবায় সমিতি স্থাপন করা; এই সমিতিগুলি উন্নত ধরনের চাষের উপযোগ্য বীজ ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে।

৬) কৃষিজ উৎপাদন থেকে লব্ধ আয় যথাসম্ভব সঞ্চয় করবার জন্য কৃষিজীবীদের শিক্ষা দেওয়া।

এই সঞ্চয় চাষ না হলে বা নষ্ট হলে তাদের সাহায্য করবে। পরিবারের উপায়ী মানুষের কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা তার মৃত্যু হলে তার নিজের বা পরিবারের অন্য সকলের জীবন ধারণের জন্যও এই সঞ্চয় সহায়তা করবে।[৩]

এমন প্রচুর বাস্তব ভাবনাচিন্তা পরাধীন দেশের মুক্তিকামী মানুষের চিন্তা চেতনায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেই ছাত্র অবস্থা থেকেই। প্রেসিডেন্সি কলেজের তরুণ ছাত্র নেতা সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ অধ্যাপকের ভারত বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্লাস বয়কট ও ছাত্র ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিলেন। ছাত্র সমাজের কাজে ব্রিটিশ বিরোধী ও দেশপ্রেমের এই বার্তা তিনি সফলভাবে পৌঁছে

দিতে পেরেছিলেন। সঙ্গে পেয়েছিলেন ওই কলেজেরই দুই বিজ্ঞানী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমর্থন।

দেশপ্রেমিক সুবক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহপাঠীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'ডিবেটিং সোসাইটি' বা বিতর্ক সভা যেখানে নিয়মিত সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বৌদ্ধিক চর্চার সুযোগ ছিল ছাত্রদের ভিতর। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ম্যাগাজিন তারই উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাংগঠনিক ও গঠনগত কাজে তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যখন তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং তিনি ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। উল্লেখ্য ওই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্কটিশচার্চ কলেজে প্রবেশের মাঝে 'বহিষ্কৃত' সুভাষচন্দ্র কটকের বাড়িতে গিয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন—কলেরা রোগাক্রান্ত রুগিদের পাশে তাঁর উপস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে উত্তর বাংলায় বন্যার ত্রাণের জন্য দুর্গত এলাকায় ক্যাম্প (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে)। তাঁর সেবাব্রতর উদ্যম ও মানসিকতার আরও পরিচয় মেলে যখন তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্ব পান। উল্লেখ্য, লন্ডন থেকে বন্ধু মারফত কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর আগামী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। মর্মস্পর্শী সে পত্রে তরুণ সুভাষ লিখেছিলেন আইসিএস-এর চাকরি প্রত্যাখ্যান করলে বাড়ি থেকে তাঁর আর দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য অর্থ নেওয়া উচিত হবে না। তিনি এও লিখেছিলেন দেশবন্ধু আগামীদিনে যে ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে চলেছেন সেখানে সাংবাদিকতার কাজ অথবা সাবএডিটরের (সম্পাদনা) কাজ করতে আগ্রহী।[৪] তিনি শিক্ষকতার কাজ করতেও

চিত্র-২ : জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভা

চিত্র-৩ : আজাদ হিন্দ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

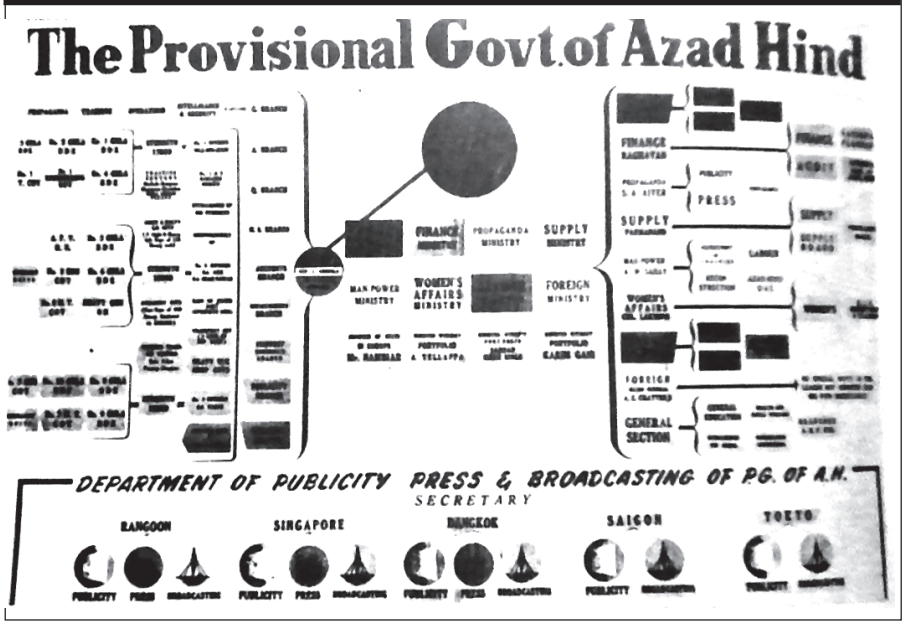

পারেন। সামান্য বেতন দিলেই হবে। রাজকীয় বেতন, ক্ষমতা, মানসম্মানের চাকরি শুধুমাত্র দেশসেবার জন্য ত্যাগ করার মানসিকতা শুধুমাত্র এ দেশে নয়, খোদ লন্ডনেও আলোড়ন তুলেছিল। সে দেশের সংবাদপত্রে ভারতীয় ছাত্র আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকারী সুভাষচন্দ্র বোসের চাকরি না গ্রহণের সিদ্ধান্তের খবর ছাপা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গলার কথা' দৈনিক পত্রিকা। সাংবাদিকতা জগতে সুভাষচন্দ্রের অবদান আলাদা মূল্যায়নের দাবি রাখে। বিপ্লবী আন্দোলনে

যোগ দিয়ে যে সমস্ত ছাত্র বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রথাগত পঠনপাঠন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষার জন্য দেশবন্ধু পরিকল্পিত জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। শিক্ষকতা, অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলে প্রয়োজনে ক্লাসরুমের টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করতেন বলে জানা যায় তাঁর সহকর্মীদের স্মৃতিকথায়। ঠিক যেমনটা জানা যায় 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার অফিসে কর্মক্লান্ত সুভাষ বহু সময় বাড়ি ফিরে যেতেন না, টেবিলে, বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।[৫]

১৯২৩-এর বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯২৪-এ চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা পুরসভার প্রথম ভারতীয় মেয়র নির্বাচিত হন। ওই সময় সুভাষচন্দ্রও পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। মেয়রের আহ্বানে ওই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি প্রথম হিসাবে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার পদে যোগ দেন। তখনকার দিনে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের মাসিক বেতন ছিল ৩০০০ টাকা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু বেতন হিসাবে নিতেন মাত্র ১৫০০ টাকা।[৬] অর্ধেক টাকা তিনি কলকাতা করপোরেশনকে দান করে দিতেন যা আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে আসে। সুভাষচন্দ্রের গৃহীত বেতনের টাকা থেকে তিনি সমাজসেবা ও দেশব্রতী কর্মীদের সাহায্য করতেন বলে জানা যায়। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় কলকাতা পুরসভার কাজকর্মে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। অন্যদিকে গুরু-শিষ্য মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি' ও অনাথ শিশুদের জন্য 'দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম' প্রথমটিতে পাঠাগারসহ দেশপ্রেমিক তরুণদের সমাজ উন্নয়নমূলক আলোচনার জায়গা অন্যটিতে অনাথ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য সুভাষচন্দ্রের ভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র। জেল থেকে পাঠানো বন্দি

চিত্র-৪ : নেতাজি স্বাক্ষরিত কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট

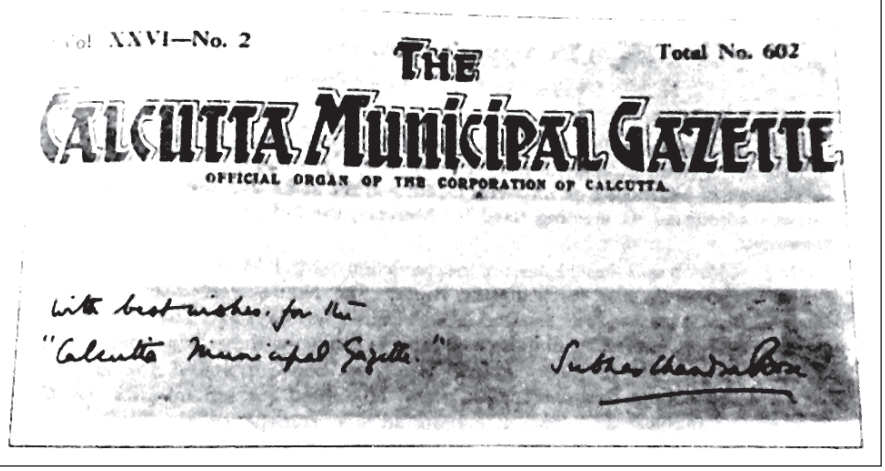

চিত্র-৫ : নেতাজি সম্পাদিত 'বাঙ্গলার কথা'

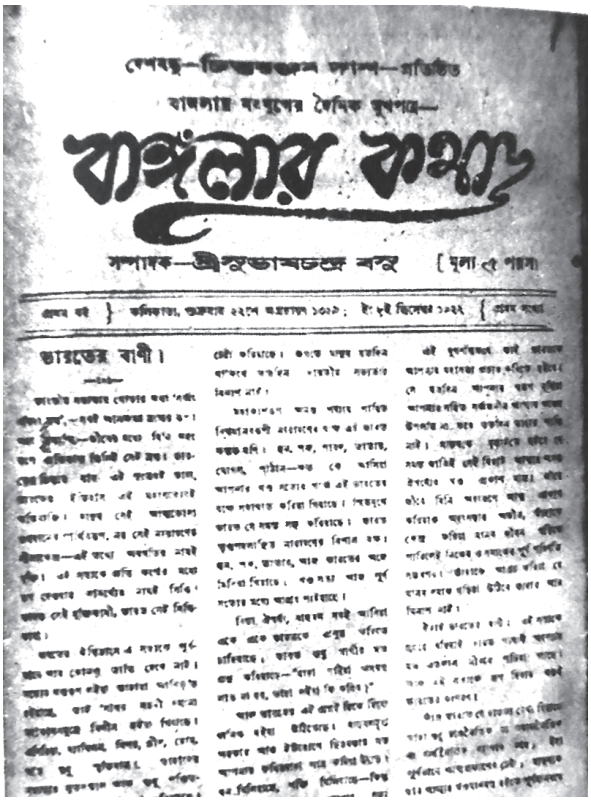

সুভাষচন্দ্র একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে—তাঁকে অনেকে অভিযোগ করেন গুটিকয় অনাথ ছাত্রের জন্য তিনি অর্থ ও সময়ের অপচয় করছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেস তিনি ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কারণ 'এমন দরিদ্রনারায়ণের সেবার সুবর্ণসুযোগ কোথায় পাইব...।' ১৯২৪-এর ১ মার্চ সুভাষচন্দ্র ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশানের সভাগৃহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দক্ষিণ কলকাতার অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে

কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়া ১৩ কাঠা জমিতে নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলেও এর আগে বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের অনাথ আশ্রম চলত।

১৯২৬ সালে ব্রহ্মদেশের (বর্তমানে মায়ানমার) মান্দালয় জেল থেকে সহকর্মী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে লিখছেন—"আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানত দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভালোরকম organise করিতে পারি নাই। তার পর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়িভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের চাঁদা হইতে নির্বাহ হইত। ...আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন।" উল্লেখ্য জেল থেকে বসে সুভাষচন্দ্র আশ্রমের গ্রন্থাগারে কী কী বই রাখতে হবে তার বিস্তারিত তালিকা, তাদের পাঠ্যসূচি ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখতেন, নির্দেশ দিতেন আশ্রমের সহ-সম্পাদককে।

এশিয়ার প্রথম পুরসংবাদপত্র 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' সুভাষচন্দ্রের মস্তিষ্ক প্রসূত। ১৯২৪-এর ১৫ নভেম্বর এই গেজেট প্রথম প্রকাশিত হল। দরিদ্র মানুষের কল্যাণার্থে এই সময় পুরসভার যে সমস্ত কর্মসূচির ঘোষণা জানা যায় তার খবর পাওয়া যায় এক বছর পূর্তির বিশেষ গেজেটের সংখ্যায়। জানা যাচ্ছে মেয়র-এর প্রথম বক্তৃতায় যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রদের জন্য নিখরচায় চিকিৎসা, সস্তায় খাঁটি খাবার ও দুধ সরবরাহ, পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জলের সরবরাহ বৃদ্ধি, বস্তি এলাকায় উন্নততর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প, সংযোজিত পুর এলাকার উন্নয়ন, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং খরচ কমিয়ে প্রশাসনের উন্নতি সাধন। আসলে, দরিদ্র জনগণ-ভারতীয় ঐতিহ্যে যাঁদের 'দরিদ্র নারায়ণ' বলা হয় তাঁদের কল্যাণই যে পুরসভা-পরিষেবার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, দেশবন্ধু তাঁদের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সে কথাটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।[৭]

চিত্র-৬ : নেতাজিকে রানি ঝাঁসি বাহিনীর গার্ড অফ অনার

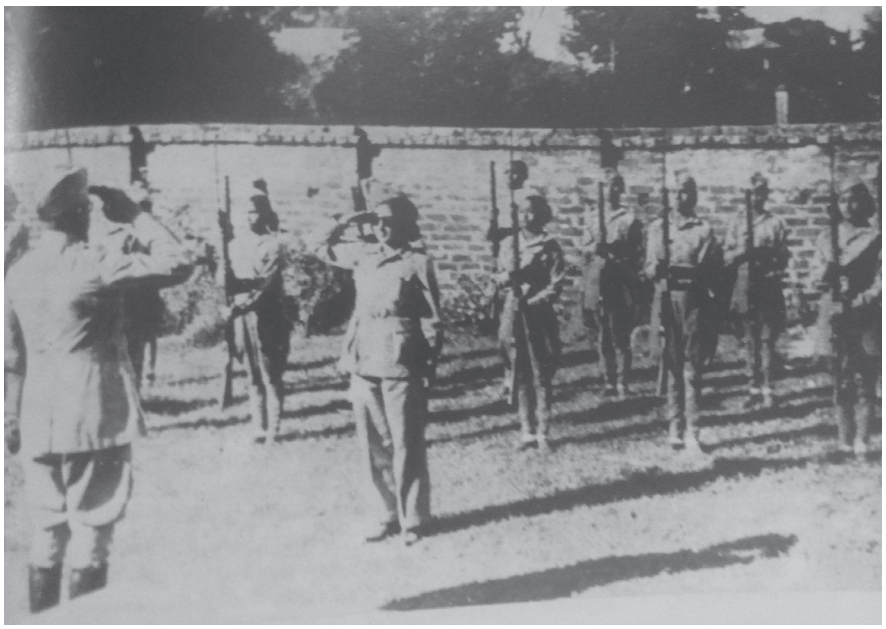

চিত্র-৭ : রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট-এর ট্রেনিং শিবির

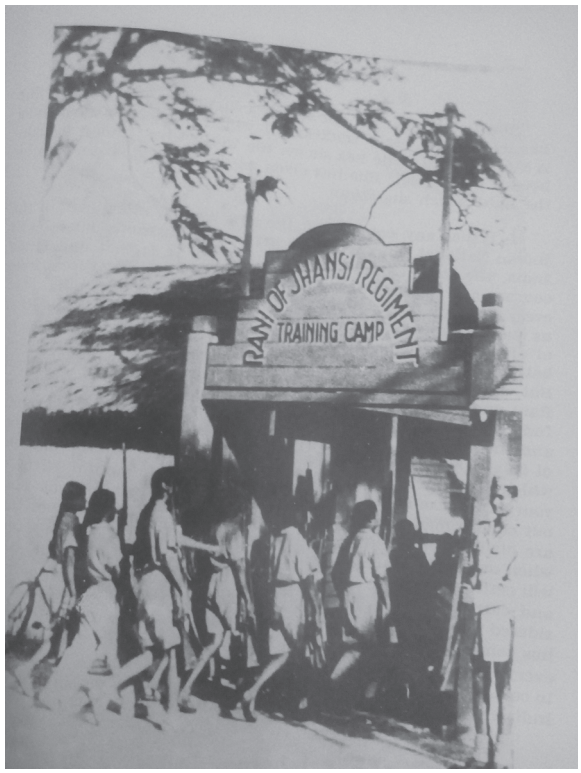

১৯২৪-এর অক্টোবরে বিপ্লবীদের যোগসাজশের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার হঠাৎই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে সুদূর

চিত্র-৮ : নেতাজির আহ্বান (তাঁর নিজস্ব হাতের লেখায়)

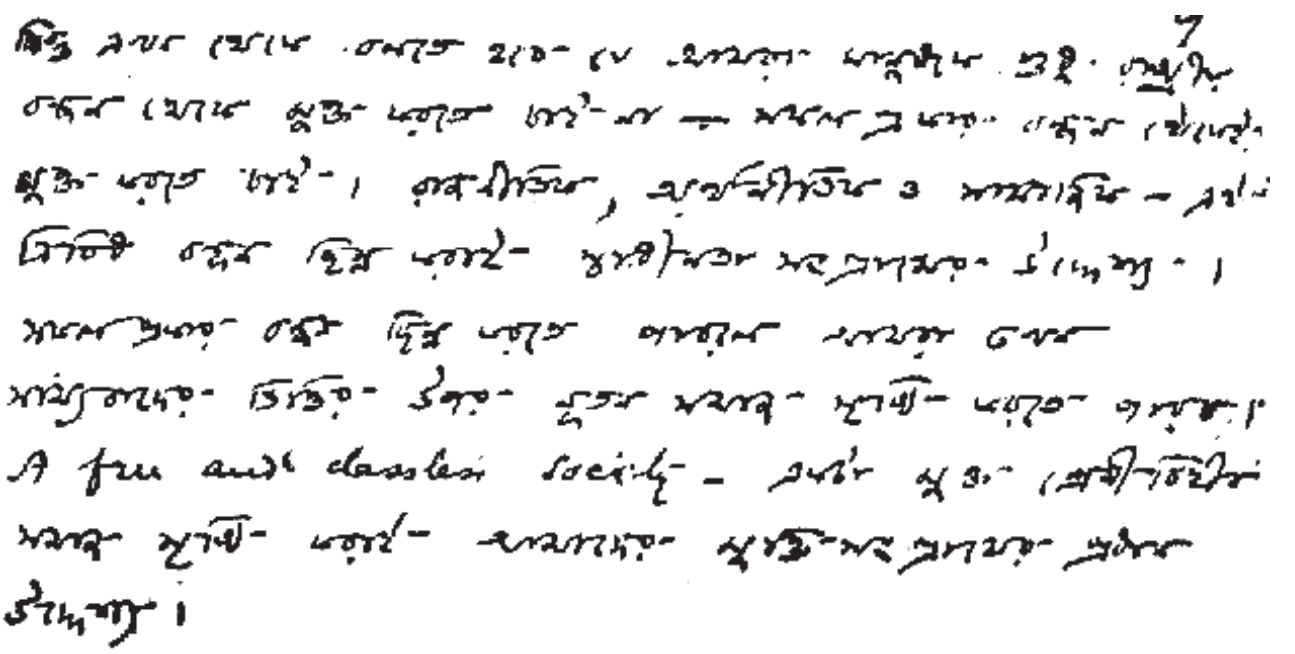

মান্দালয় জেলে দীর্ঘ সময় বন্দি করে রাখে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ১৯২৭-এ তিনি মুক্তি পান। অন্যদিকে ১৯২৫-এর ১৬ জুন হঠাৎই দেশবন্ধুর প্রয়াণের সংবাদ পান সুভাষচন্দ্র। পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়েছেন, নির্বাচিত হয়েছেন অল্ডারম্যান হিসাবেও কিন্তু পুরসভা পরিচালনার অখণ্ড অবকাশ তিনি পাননি। ১৯৩১-এর ২৬ জানুয়ারি মেয়র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চালনা ও তাঁর গ্রেপ্তার পুরসভার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সময় বারংবার পৌরসভার নানা প্রকল্পের পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন সহকর্মীদের কাছে চিঠি মারফত।

১৯২৫-এ মান্দালয় জেল থেকে এক বার্তায় তিনি লিখছেন—"পৌর শাসনের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা এবং করদাতা ও পৌরশাসকদের সহযোগিতার ওপর। আমার বিশ্বাস এই গেজেট নাগরিকবৃন্দের সচেতনতা জাগ্রত করতে সাহায্য করবে এবং উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগসূত্র যাপন করতে সক্ষম হবে।...'

তিনি আগামী নতুন বছরে গেজেটে কোন কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই নিয়ে এক চোদ্দোদফা কর্মসূচির ভাবনার কথা লিখেছেন যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পৌর সমাজতন্ত্র বা মিউনিসিপ্যাল সোশ্যালিজম-এর ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরসভা প্রকল্পের মধ্যে সুভাষচন্দ্র একদিকে যেমন চেয়েছিলেন রাস্তার আলো, মহামারী প্রতিরোধ, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও হাসপাতালের উন্নতি সাধন। তেমনই তিনি দৃষ্টি দিতে চেয়েছেন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বস্তি উন্নয়ন, দরিদ্র মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ বিষয়ে। তিনি মোটর ভেইকলস্ বিভাগ ও পৌর রেল ব্যবস্থার পুনর্গঠন, দুধ সরবরাহ, বার্ধক্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসালয় এবং সমাজের গভীর সমস্যা পতিতাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা নিয়েও তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন অন্যদিকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে তিনি ভাবতে শুরু করেছেন রঙ্গমঞ্চ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, (পরবর্তীকালে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) পৌর মিউজিয়াম বা গবেষণার বিষয়ে।

পৌর পরিষেবার এমন উদার পটভূমির পাশাপাশি জেলে বসেই পুরপ্রশাসন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৯২৫ তারিখে লেখা এক চিঠিতে তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে খাদ্য অপচয় রোধ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হিমঘর প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যাধরী নদী সংস্কারের নানা সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রাস্তার গ্যাসের আলোর বৈদ্যুতিকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং বসন্ত রোগ প্রতিরোধের নানা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন তরুণ সুভাষচন্দ্র। বাবু কালচারে সমৃদ্ধ পুরোনো কলকাতার খোলনলচে বদলে জনমুখী উন্নয়নমূলক ভাবনাচিন্তার বাস্তবায়নের পথে কলকাতা পুরসভা হেঁটেছিল সুভাষচন্দ্রের হাত ধরেই, খেলাধুলায় উৎসাহ দেবার জন্য পার্ক নির্মাণ ও তার সংরক্ষণের ভাবনাচিন্তা সুভাষচন্দ্রেরই। ১৯২৬-এর এপ্রিল-এ আর একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন বিশেষ বিশেষ পণ্যের জন্য এক একটি এলাকায় সেন্ট্রাল মার্কেট গড়ে তুলতে পারলে সাধারণ মানুষের কত উপকার হতে পারে। এরই সঙ্গে তিনি তাঁর নানা অভিনব চিন্তার কথাও বলেছেন। যেমন তিনি চেয়েছিলেন গরিব

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বা আদর্শ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনের কাজ শুরু করতে, এবং একই সঙ্গে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যসূচিতে তিনি পৌর প্রশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। আজ যখন সারা ভারত জুড়েই স্বচ্ছ ভারত ভাবনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সে দিনের প্রায় তিরিশ বছরের কারারুদ্ধ যুবক সুভাষচন্দ্রের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার অবকাশ রয়ে গেছে। তিনি মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌর প্রশাসন বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার নানা সম্ভাবনাময় পথ উন্মুক্ত হবে। পরবর্তীকালে ইউরোপে থাকাকালে তিনি ভিয়েনায় পুরসভার সমাজতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। বম্বে পুরসভার অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ভিয়েনা পুরসভার নাগরিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন ভিয়েনা পুরসভা গত ১২ বছর পুরসভার ২ লক্ষ বস্তিবাসীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। তার জন্য ঋণ বা অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানোর প্রয়োজন হয়নি।[৮] পৃথিবী ব্যাপী পুরসভা সচেতন বা অবচেতন ভাবে পৌর সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে বাকিংহাম পুরসভা নাগরিকদের জন্য ঋণদান ব্যাংকের প্রবর্তন করেছে। সুভাষচন্দ্রের ভাষণ থেকে অনুধাবন করা যায় পৌর সমাজতন্ত্র আসলে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে সমাজের জনগোষ্ঠীর সেবা প্রচেষ্টা, "Municipal Socialism is nothing but collective effort to serve the entire community."[৯]

সুভাষচন্দ্রের পুরসভার সময়কালীন নানা রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘাতে যেমন জড়িয়েছেন তেমনি কারারুদ্ধ হয়ে নানা বিচিত্রমুখী চিন্তা ও প্রকল্প রচনা-রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তীকালে পৌরসভা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পৌর-প্রশাসন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের এটি এক অনন্য মৌলিক অবদান।[১০]

সুভাষচন্দ্র যখন পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্রিটিশমুক্ত মাতৃভূমির উজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের এক ভাবনার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন আজাদ হিন্দ সরকার ভারতকে স্বাধীন করলে সে দেশের মানুষের অধিকার থাকতে নতুন গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন ও নেতা নির্বাচন করার তাই তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের আগে 'অস্থায়ী' শব্দটি রেখেছিলেন। ভারতের জনগণের কাছে পরিচিত চরকা শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা ব্রিটিশ ভারতে অধিকৃত অঞ্চলে ওড়াতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং লোকাল গভর্নমেন্ট বা আজকের পঞ্চায়েতের ধাঁচে উত্তরপূর্ব ভারতে বহু গ্রামে তিনি আজাদ হিন্দ-এর ব্রিটিশমুক্ত শাসন কিছু দিনের জন্য হলেও বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আজাদ হিন্দ-এর মুদ্রা ও টাকার পাশাপাশি নিজের ছবি ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতীক-সহ বন্ড ছেড়ে ছিলেন যুদ্ধ ও প্রশাসন চালানোর খরচ তুলতে। বৈদেশিক ঋণও তিনি মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রবাসী ভারতীয়রা ধন অর্থ সর্বস্ব নেতাজির আহ্বানে দান করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই অদেখা অচেনা মাতৃভূমির মুক্তির সংগ্রামে। সরকারের নিজস্ব টাঁকশাল না থাকায় রানির ছবি মুদ্রিত মুদ্রার ওপর প্রথম দিকে আজাদ হিন্দের শিল দিয়ে কাজ চালানো হত। পরবর্তীকালে নিজস্ব মুদ্রায় ডাকটিকিট, একাধিক বেতার পত্র, প্রশিক্ষণ শিবির, বিভিন্ন দপ্তর যেমন প্রোপাগান্ডা, প্রেস প্রভৃতি পরিপূর্ণ চেহারার এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন সরকার গঠনের সূত্রপাত ও অভিজ্ঞতা সম্ভবত কলকাতা পুরসভার দায়িত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে তিনি সামরিক ট্রেনিং-এর সুযোগ পেয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর্সের সদস্য হিসাবে। আজাদ হিন্দ সরকারের ভিতর জাতপাত ধর্ম বর্ণ বিদ্বেষের সমস্ত সীমারেখা ম্যাজিকের মতো মুছে দিয়েছিলেন নেতাজি। বহু বিদেশি ঐতিহাসিক গবেষক একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন আজাদ হিন্দ-এর ঐক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা মুক্ত ঐতিহ্যকে। ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সম্বোধন হয়ে দাঁড়ায় 'জয়হিন্দ' যেখানে একমাত্র জন্মভূমি হিন্দুস্থানের জয়ধ্বনি পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, ইশাই সবার রান্না খাওয়া একই সঙ্গে হত। তাদের একটাই পরিচয় ছিল তারা ভারত মায়ের বীর সন্তান। নেতাজি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ও ধর্মে বিশ্বাসী হলেও প্রকাশ্যে কখনও কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। তাঁর ক্যাবিনেটের হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইশাই সকল সদস্যের নিয়েই চেটুর মন্দিরে গিয়ে আজাদ হিন্দ-এর জন্য দান গ্রহণ করেছেন সমস্ত গোঁড়ামিকে সকলের সহমত ও সহনশীলতার মাধ্যমে।

সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে একমাত্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতাই পারে সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে জাতিকে বাঁচাতে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা চলে গেলে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না— 'Communalism will go only when the communal mentality goes.' যদি সমগ্র দেশব্যাপী এক স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা যায়, তখনই উবে যাবে সাম্প্রদায়িক

মানসিকতা। ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সমস্ত দেশবাসীকে বোঝাতে হবে যে মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্য নেই; আসল পার্থক্য ধনী এবং দরিদ্র—এই দুই শ্রেণির মধ্যে। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, দেশের দরিদ্র, অভাব, অনটন, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব এবং রোগ ব্যাধি দূর করতে গেলে দরকার এক স্বাধীন ধর্ম নিরপেক্ষ জনদরদি সরকার।[১১]

নেতাজির সহযোদ্ধা বিপ্লবী অনিল রায় তাঁর 'নেতাজির জীবনবাদ' বইতে তুলে এনেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মেলবন্ধনের স্বরূপটিকে।

'সুভাষচন্দ্র শুধু ব্যক্তি নন, তিনি সঞ্চিত ঐতিহাসিক প্রয়োজনের যুগমূর্তি। নেতাজি ও আজাদ হিন্দ আজ জনতার মর্মবাণীর বিগ্রহরূপ। পরাধীন ভারতবর্ষের সঞ্চিত বেদনার ভাবমূর্তি। নেতাজির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ভারতবর্ষের মর্মবাণী...এই গ্রহীষ্ণুতাই ভারতের সমাজ ধর্ম। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বিরোধের মধ্যে সমন্বয়, এই হল চিরন্তন ভারতের স্বধর্ম। এই স্বধর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে নেতাজি ডাক দিয়েছেন।...'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ যখন দ্রুত দেশভাগের মাধ্যমে ভারত-ত্যাগের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই যুদ্ধোত্তর পরিধির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বলেছিলেন যে 'আমরা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছি। আজাদ হিন্দ সেনানীদের লালকেল্লায় বিচার চাই,' এবং দেশজুড়ে গণ অভ্যুত্থান ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে।

'তরুণের স্বপ্ন'-এর সেই দেশনায়ক পরাধীন দেশের যন্ত্রণা নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন প্রায় ৭৫ বছর আগে। নিজের জীবন বীণায় ঝংকার তুলে জাতিকে জাগাতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন বারংবার। জ্বলন্ত দেশপ্রেম আর অদম্য সাহসের রূপকথাসম তাঁর জীবন গাথায় জড়িয়ে আছে ভারতের পথ চলার নির্দেশ, ভাবনা, পরিকল্পনা। শুধু যথার্থভাবে খুঁজে নেওয়ার প্রতীক্ষা। আজকের সাইবার যুগে যুবসমাজের কাছে, সোশ্যাল মিডিয়ার বদান্যতায় আইকন খুঁজতে, আইডল খুঁজতে, বাণিজ্যিক ভাবনার আড়ালে আশ্রয় নিতে হয় অথচ চিরকালীন গর্বের যে ঐতিহ্য আমরা পেয়েছি, তিনি যা রেখে গেছেন তা হারিয়ে যায়—'ফুলের মালা আর ধুপের ধোঁয়ার আড়ালে'। নেতাজির স্বপ্ন ও সাধনায় খুঁজে পাওয়া যায় ভারতের মর্মবাণী, দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ।❑

[লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর ডক্টরেট, নেতাজি সম্পর্কিত নানা গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন।
email : joy_hind@rediffmail.com]

সূত্র :

(১) সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
(২) তদেব
(৩) তদেব
(৪) 'প্রেসিডেন্ট এগেইনস্ট দ্যা রাজ'—জয়ন্ত চৌধুরী
(৫) ট্রুথ অ্যাবাউট দ্যা ইন্ডিয়ান প্রেস—জে. এন. সাইনি
(৬) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু : জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(৭) কলকাতা পুরশ্রী—নেতাজি জন্মশত বার্ষিক সংকলন
(৮) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু : জন্মবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(৯) তদেব
(১০) কলকাতা পুরশ্রী—নেতাজি জন্মশত বার্ষিক সংকলন
(১১) দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)—বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

নৈতিকতাভিত্তিক সমাজের দিকে

একসঙ্গে বাঁচার শিক্ষা

বিশ্বায়নের যুগে, ভোগবাদী সমাজে কেবলই আরও পাওয়ার নেশায় ছুটছে পৃথিবী। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের পরিবর্তে ঘটছে প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। এভাবে চললে মানবসমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা কি আদৌ সম্ভব—বর্তমান নিবন্ধে জরুরি এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন **জে এস রাজপুত।** *গান্ধীজির বাণী ও আদর্শ কীভাবে পৃথিবীর রোগমুক্তির দিশা হতে পারে, শিক্ষা কীভাবে হয়ে উঠতে পারে নৈতিকতা ভিত্তিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার—তারও বিশদ আলোচনা রয়েছে এই পরিসরে।*

"জ্ঞান যদি শুধু জ্ঞান হিসাবেই থেকে যায়, তাহলে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার কোনও সম্ভাবনা নেই। জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পরিণত করতে পারলে মানুষ শুধু অস্তিত্বরক্ষাতেই সমর্থ হবে না, সে সাফল্যের এক মিনার থেকে অন্য মিনারে পৌঁছবে।" —জর্জ বার্নার্ড শ

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষেরই কোনও কিছু আবিষ্কার করার, তাকে আরও উন্নত করার এবং সৃজনের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা সে কাজে লাগায় জীবনের মান উন্নততর করতে, আরও জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের লক্ষ্যে। মানবসভ্যতা যত এগিয়েছে, ততই এক প্রজন্মের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার গুরুত্ব বেড়েছে। এই দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রত্যেক সভ্যতাতেই নবীন প্রজন্মকে 'শিক্ষিত' করা হয়। প্রাচীনকালে কাগজ-কলমের সাহায্য না নিয়ে শুধু মুখে বলে ও কানে শুনে এই কাজ করা হত, তা ভাবলে অবাক লাগে। বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ, বিকাশ, উন্নয়ন, পরিবহণ ও ব্যবহার করা হয়। আলোচনা, বিনিময়, কারিগরি সহায়তা এবং তথ্য-প্রযুক্তি এই প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করে। এগুলিও মানুষের নিরন্তর প্রয়াসের ফল। পঞ্চাশ বছর আগেও আই প্যাড বা ল্যাপটপ, অধিকাংশ মানুষের কাছে আজগুবি ভাবনা ছিল। আজ মানবসভ্যতা যেসব সুফল ভোগ করছে, তা বহু মানুষের দীর্ঘদিনের সাধনার সম্মিলিত ফল। মানবকল্যাণকেই এঁরা জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্বের যে কোনও স্থানেই জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটুক না কেন, দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে তা মানবসভ্যতার কাছেই লেগেছে। আজ মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে বুঝতে শিখেছে। এই সম্পদকে কীভাবে মানবসভ্যতার উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়, তাও শিখেছে মানুষ। সে জানে, সব মানুষের ভবিষ্যৎ এক ও অভিন্ন। একে আরও সুন্দর, আরও উন্নত করে তুলতে পারস্পরিক বিনিময় ও সংবেদনশীলতার গুরত্বও বোঝে সে। এই ভাবনা আসে মানুষের চিরন্তন মূলগত ঐক্যের ভিতর থেকে। আমরা জানি, সারা বিশ্বই এক বৃহৎ পরিবার।

তবে শুধু শান্তি আর প্রগতির লক্ষ্যেই নয়, ইতিহাস বলছে, সঞ্চিত জ্ঞানের ব্যবহার হয়েছে নেতিবাচক দিকেও। মানুষ এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, দাসত্ব, বর্ণবৈষম্য ও অন্যান্য অমানবিক প্রথার। মানুষ পরমাণু শক্তির অধিকারী হবার পর সৃষ্টি হয়েছে হিরোসিমা ও নাগাসাকির মতো ট্র্যাজেডির। মানুষকে আজ মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার হামলার মোকাবিলা করতে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত জেনেও মানুষ নির্বিচারে তার অপব্যবহার করে। এই পৃথিবী ছাড়া জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ কোথাও নেই, এই সত্য মনে রেখেও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের তাগিদ জানে না সবার মনে। লোভ যখন মানুষের বিবেককে ছাপিয়ে যায়, তখনই প্রস্তুত হয় হিংসার উর্বর ক্ষেত্র। মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করাটাই নিয়ম হয়ে ওঠে। তবে বর্তমানে যেমন নির্বিচারে মানুষ ও প্রকৃতির সংবেদনশীল সম্পর্কের ওপর কুঠারাঘাত করা হচ্ছে, তেমনটা আগে কখনও দেখা যায়নি। এ বিষয়ে যিনি কোনও খোঁজখবরই রাখেন না তিনিও মজে আসা নদী এবং দূষণে ভরা বাতাস ও জল দেখে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন। ভোগবাদী সভ্যতায় বেপরোয়া মানুষ এমন এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে যেখানে তাকে নিত্যনতুন স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রের অভূতপূর্ব উন্নতিও একে সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না। ত্রুটি সংশোধনের আন্তরিক উদ্যোগ অবিলম্বে নেওয়া না হলে পৃথিবীর অস্তিত্ব আদৌ কতদিন থাকবে, তা এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগটা জানা, এর ওষুধও হাতের কাছে। কিন্তু আরও আরও পাওয়ার নেশায় উন্মত্ত দেশগুলি এবং তাদের নেতারা কিছুতেই সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করে উঠতে পারছেন না। মানুষ ও নেতাদের সমস্যাটা কোথায়? কেন মানুষ নিজেই নিজের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করছে? হিংসা ও হানাহানির মধ্যে দিয়ে শান্ত, সুচারু জীবনকে বিপর্যস্ত করে পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলছে? এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানও চিরন্তন। বহু আগে বেদে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। বেদান্তের সঙ্গে যাঁরা অপরিচিত, তাঁদের প্লেটোর কথা বলা যেতে পারে। প্লেটো তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, ভালো জীবনযাপনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাই

যথেষ্ট নয়, মানুষকে ভেতর থেকে ভালো হতে হবে। 'আমি কী করব' থেকে প্রশ্নটা যদি 'আমি কেমন মানুষ হব'তে পরিবর্তিত হয়, তাহলেই উত্তরের সন্ধান মিলবে বলে প্লেটো মনে করতেন। এখানেই শিক্ষক ও শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা। শিক্ষক অজ্ঞানতার আঁধার ঘুচিয়ে একজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সঞ্চার ঘটান। মানবিকতা থেকে দেবত্বের দিকে উত্তরণ ঘটান শিক্ষক। সেই লক্ষ্য অর্জিত হলে সত্য, অহিংসা ও শান্তি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। ভালোবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বে ছেয়ে থাকত আকাশ-বাতাস। এগুলিই হয়ে উঠত শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষকের কাজ শুধু পাঠ্যসূচি শেষ করানো নয়। তিনি একদিকে তাঁর ছাত্রদের আদর্শ, অন্যদিকে জাতি গঠনের কারিগর।

বস্তুতান্ত্রিক প্রবণতা আজকের পৃথিবীতে সবার জীবনকেই অল্পবিস্তার প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষা বরাবরই মানবসভ্যতার সামনে আশার আলো হয়ে থাকবে। জ্ঞানের অন্বেষণ প্রয়োজন, তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষার জন্য জ্ঞান ও বিবেক—দুই-ই একান্ত আবশ্যক। এই সতর্কবার্তা আমরা যে অনুভব করি না তা নয়, তবে তাকে অনায়াসে উপেক্ষা করি। মহাত্মা গান্ধী যখন বলেছিলেন, প্রকৃতির কাছে সবার প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট সম্পদ থাকলেও লোভ চরিতার্থ করার মতো সহায় নেই, তখন তিনি এই কটি কথায় মানবজাতির ভবিষ্যতের ছবিটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সংবেদনশীল সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার না করার সতর্কবার্তা। ভারতীয় দর্শনে অপরিগ্রহের ধারণা একইসঙ্গে এক মূল্যবোধ এবং এক সতর্কতা। আজকাল আমরা প্রায়শই নানা শিখর সম্মেলনে বিশ্বের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কথা শুনতে পাই। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। সকলেই 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' নিয়ে কথা বলেন, অথচ এর মোকাবিলা কীভাবে করা সম্ভব, তা স্পষ্ট হয় না। একমাত্র পথ হল শিক্ষা, স্কুল, কলেজ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র-নীতিবোধ, শুশ্রূষা ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় বহু আগে ভারতীয় সভ্যতা শুধু যে জীবনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছিল তাই নয়, জীবনের পর কী হয় তা নিয়েও অনুসন্ধিৎসার সীমা ছিল না। এই অন্বেষণের পথে নিজেদের মতো করে তাঁরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য খুঁজেছিলেন। এ থেকেই দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার জন্ম হয়েছিল। সারা বিশ্ব সেই ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আধ্যাত্মিক এষণা জীবনকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। সঠিক আচরণ, অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা, মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরকালীন আত্মীয়তা, শান্তি—এই সবকিছুর গুরুত্ব বুঝিয়েছে এই বোধ। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক কেন সযত্নে রক্ষা করা উচিত, তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছে ভারতীয় জীবনবোধ। এক্ষেত্রে মানুষের ওপরেই গুরুদায়িত্ব রয়েছে, কারণ মানুষেরই একমাত্র চিন্তা করার, দূরদৃষ্টির, পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং প্রয়োজনমতো তা সংশোধন করে নতুন কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। বহুল আলোচিত ডেলোরস কমিশন রিপোর্টে (ইউনেস্কো, ১৯৯৬) একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা প্রসঙ্গে সাত ধরনের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। মানুষকে বর্তমানে এগুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এগুলি হল—

- বিশ্বজনীন ও স্থানীয়
- বিশ্বজনীন ও ব্যক্তিগত
- প্রথানুসারী ও আধুনিক
- দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন বিবেচনা
- প্রতিযোগিতা ও সুযোগের সমতা
- জ্ঞানের বিস্ফোরণ ও গ্রহণের ক্ষমতা
- আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত

এই দ্বন্দ্বগুলির ফল এখন সবারই জানা। অবিলম্বে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। একদিকে রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা। অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্মকে ক্রমশ বেড়ে চলা হিংসা, উন্মত্ততা ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই পরিবেশে মানুষের প্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। এছাড়া প্রতিটি দেশকেই বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি, উন্নত দেশগুলির দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এই সহযোগিতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না এবং প্রায়ই প্রগতির আদর্শ নিয়ে দু দেশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক দেশের ক্ষেত্রে যা উপযোগী, অন্য দেশের কাছে তা যথাযথ নাই হতে পারে। এর ফলে এক ধরনের 'নীতিগত সংকট'-এর জন্ম হয়, যা প্রতিটি দেশকেই এখন ভোগ করতে হচ্ছে।

'মানবিক' মানুষ তৈরি

প্রতিটি সভ্যতা ও ধর্মই তার নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করে। যাতায়াতের সুবিধা বাড়ায় এখন একই গোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বাস করেন, একত্রে কাজ করেন। ২০০১ সালের টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডি থেকে আমরা জেনেছি, সেই সময়ে ৬০টি দেশের তরুণ-তরুণীরা টুইন টাওয়ারে কাজ করছিল। তাদের জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং সামাজিক প্রেক্ষিত ভিন্ন, কিন্তু তারা শিখেছে কীভাবে সম্মিলিত প্রয়াসে আগামীর পৃথিবী রূপ নেয়, কীভাবে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হয়। মানবতার মূল ভিত্তি হিসাবে একতা ও সাম্যকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করলে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত ও জাতিগত বিভিন্নতা মানুষের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। শিশুর বেড়ে ওঠার সময়ে এবং তরুণদের শিক্ষাদানের সময়ে এই বোধ তাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়।

শিক্ষার কোন আদর্শটি গ্রহণ করা হবে, কোনও দেশ কীভাবে তা স্থির করে? একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রতিটি দেশের শিক্ষা দায়বদ্ধ থাকবে প্রগতির প্রতি, তার শিকড় প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে। ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই স্পষ্ট যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা শিক্ষা স্বদেশের মাটিতে বিকশিত হতে পারে না। স্বাধীনতার পরেও ভারত সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকে, যা বিদেশি শাসকদের জন্য নীচুতলার কর্মী তৈরির জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থা সবার জন্য ছিল না, এর যোগ ছিল না ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে। কিছু চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে কোনও দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মানুষের মধ্যে শক্তি ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। প্রতিভাত হয় বৈচিত্রের সৌন্দর্য।

সেজন্যই পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ তৈরি করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের নাম শিক্ষা।' এই কটি মাত্র শব্দে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রক্রিয়া ও সামগ্রিকতার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে দেখেছিলেন মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের শুধু কিছু তথ্য দেয় না, তা আমাদের জীবনকে অন্য সব অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।' ১৯০৯ সালে লেখা 'হিন্দ স্বরাজ' প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। এখানেও মানুষ তৈরির কথা বলা হয়েছিল। 'সেই মানুষটিই উদার শিক্ষা পেয়েছে, যুবা বয়সে পাওয়া প্রশিক্ষণের দৌলতে যার শরীর তার মনের অনুগত ভৃত্য। যেকোনও কাজই সে অনায়াসে, আনন্দের সঙ্গে করতে পারে। তার মন স্পষ্টভাবে ঠান্ডা মাথায় যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা করতে পারে। তার মনে প্রকৃতির মৌলিক সত্যগুলির জ্ঞান রয়েছে। তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি বিবেকের অধীন। সে যেকোনও প্রলোভনকে দমন করতে পারে। সে অন্যদেরও নিজের মতোই সম্মান দেয়। এই মানুষটিই যথার্থ শিক্ষা পেয়েছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে। নিজের ভেতরের ভালোটাকে সে বের করে আনতে পারবে।' এই ধরনের শিক্ষার খোঁজ বিশ্ব জুড়েই চলতে থাকে। এটাই সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের চিহ্ন। হাক্সলে বলেছিলেন, 'সুউন্নত সুসংযুক্ত ব্যক্তিত্বই বিবর্তনের সর্বোত্তম ফল। মানুষের প্রকৃতি ও তার অসীম সম্ভাবনার অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। বিপুল সম্ভাবনার এক অনাবিষ্কৃত বিশ্ব তার কলস্বাসের জন্য প্রতীক্ষা করছে।' ডক্টর রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, 'শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল এমন মুক্ত সৃজনশীল মানুষ তৈরি করা, যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বিরূপতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে।' বর্তমানে বিশ্বায়ন, ক্রমবর্ধমান সংযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার যে পৃথিবী, তাতে যারা নিজেদের জ্ঞান ও বোধগত মূলধন বাড়াতে পারছে তারাই অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু বিশ্ব এখনও জ্ঞানগত মূলধনের প্রতি ততটা সজাগ নয়, তারা ব্যস্ত আর্থিক মূলধন জোগাড়ে। আর এ জন্য প্রায়শই তারা প্রকৃতির ওপর অত্যাচারে লিপ্ত। এই ভুল পথের জন্যই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় উত্তরাখণ্ডে, দুর্গতিতে পড়েন মুম্বই-চেন্নাইয়ের মানুষ। দিল্লির মানুষ যে বাতাসে শ্বাস নেন, তা মারাত্মক। শিশুদের পক্ষে তা আরও বিপজ্জনক। তবুও বাতাসে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অর্থহীন উন্নয়নের এই ধারায় জলের প্রাকৃতিক সঞ্চয় শুকিয়ে যাচ্ছে। মজে যাচ্ছে নদীগুলি। গঙ্গার মতো নদীও আজ বিপন্ন। মূল্যবোধের এই অবক্ষয় কি মানবজাতির অস্তিত্বের গোড়ায় আঘাত হানছে না? এ থেকে বাঁচতে হলে শিক্ষাকে তার উদ্দেশ্য পূরণে তৎপর হতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, 'পৃথিবীকে বদলাতে মানুষের হাতে থাকা সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র হল শিক্ষা।' সেই শিক্ষা আমাদের 'শরীর, মন ও আত্মা'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ বের করে আনবে। ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশে পরিবার ও গোষ্ঠীকেও তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

কী করা যায়?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বহু দিক থেকেই অনন্য। এর সবথেকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি এবং সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। একটি মাত্র বাক্যে তিনি তাঁর আদর্শকে সংহত করে গেছেন—'আমার জীবনই আমার বাণী।' তাঁর কাজ ও জীবন দিয়ে গান্ধীজি কোটি কোটি ভারতীয়কে নীতিনির্ভর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁরা অসহায়কে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন, দেশ ও দেশবাসীর জন্য হাসিমুখে চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছেন। অশিক্ষায় ভরা ভারতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা ও সংবাদমাধ্যমের দুর্বল অস্তিত্ব সত্ত্বেও সেই সময়ে গান্ধীজির ভাবনা কীভাবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা মনে করলে এখন বিস্ময় জাগে। গান্ধীজির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কথাবার্তা ও আলাপচারিতা থেকে তাঁর আদর্শ ও ভাবনা ছড়াতে শুরু করে। এক্ষেত্রে গান্ধীবাদী স্কুলশিক্ষকদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁরাই খাদির প্রসার ও অপরিগ্রহের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছিলেন। অপরিগ্রহ—অর্থাৎ নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কোনও প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেওয়া। ১৯২৫ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজি সাতটি সামাজিক পাপের কথা বলেছিলেন। এগুলি হল—

- নীতিহীন বাণিজ্য
- চরিত্রহীন শিক্ষা
- বিবেকবর্জিত আনন্দ
- আদর্শহীন রাজনীতি
- মানবতাহীন বিজ্ঞান
- শ্রমহীন সম্পদ
- সেবাহীন পূজা

এই সাতটি বিষয় প্রতিটি দেশের পরিকল্পনাকারীদের সামনে সার্বিক নীতি নির্দেশিকার মতো। নৈতিকতা নির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে মনন ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন ভারতের কাছে অধরাই থেকে যাবে। এই সাতটি পাপকে বর্জন করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে সমাজের চেহারাটাই পালটে যাবে। আন্তরিক প্রয়াসে একবার যদি মানুষ এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, তাহলে কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ—সবকিছুরই আমূল রূপান্তর ঘটবে। এই রূপান্তর সাধনের পথে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পেশাদার, প্রতিটি অভিভাবককে নিজের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু প্রতিদিন ভাবুন—আজ আমি অন্যের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য কী করলাম? সত্যের পথ লঙ্ঘিত হতে পারে, এমন কী ভুল আমি আজ করেছি? এভাবেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হবে। প্রত্যেকেই অপরের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠবেন। বাড়ি, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র—সর্বত্রই এক পরিপূর্ণ, সৃজনশীল, অবদানমুখী জীবনের পরিবেশ গড়ে উঠবে। ❑

[লেখক পদ্মশ্রী ভূষিত শিক্ষাবিদ। NCTE-র সভাপতি ও NCERT-র নির্দেশক ছিলেন। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংগঠন UNESCO তাঁকে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'জাঁ আমোস কমেনিস' মেডাল দিয়ে সম্মানিত করে।

email : rajput.js@yahoo.co.in]

জানেন কি ?

‘সকলের জন্য শিক্ষা’ উন্নয়ন সূচক

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থা ইউনেস্কো-র ‘সকলের জন্য শিক্ষা’ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটা সমন্বিত সূচক হল ‘সকলের জন্য শিক্ষা’ উন্নয়ন সূচক। ২০১৫ সাল পর্যন্ত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কতটা প্রগতি হল, তা এই সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ‘সকলের জন্য শিক্ষা’-র ছ’টা লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে চারটে লক্ষ্যমাত্রাকে এই সূচকে বিবেচনা করা হয় সেগুলো হল—(১) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, (২) প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা, (৩) শিক্ষার মান এবং (৪) লিঙ্গ সাম্য। এই সূচকের প্রত্যেক উপাদানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রত্যেক লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য বিকল্প হিসেবে একটা করে নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার নির্দেশক প্রাথমিক বিন্যস্ত নিট ভর্তির অনুপাত (প্রাইমারি অ্যাডজাস্টেড নেট এনরোলমেন্ট রেশিও বা ANER)—যা প্রাথমিক স্কুলের উপযুক্ত বয়সের শিশুদের কত শতাংশ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, সেই পরিমাপ। এই মাত্রা ০ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে হতে পারে। এই অনুপাত ১০০ শতাংশ হওয়ার মানে যে স্কুল যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের সব বাচ্চাই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ১৫ বছর ও তার বেশি বয়স্কদের সাক্ষরতার হারকে বিকল্প নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য অন্যতম উপায় হল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে থাকা পড়ুয়াদের হার এবং অবশেষে লিঙ্গ সাম্যের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আর প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য সূচকগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে যে গড় হার পাওয়া যায়, তা থেকেই এই লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

‘সকলের জন্য শিক্ষা’ উন্নয়ন সূচক শতাংশে প্রকাশ করা হয় বলে এর মান শূন্য থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে হতে পারে। অনুপাত হিসেবে এই সূচক প্রকাশ করলে এর মান শূন্য থেকে এক (০-১)-এর মধ্যে হবে। যে কোনও দেশের ‘সকলের জন্য শিক্ষা’ উন্নয়ন সূচকের মান হল চারটে বিকল্প নির্ধারকের গাণিতিক গড় হিসেব। এই সূচকের মান বেশি হওয়ার অর্থ, সেই দেশ ‘সকলের জন্য শিক্ষা’-র লক্ষ্যে ততটাই এগিয়ে রয়েছে।❑

সারাংশ

কোনও পড়ুয়ার কৃতি ও প্রগতির সামগ্রিক আত্ম-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার অনলাইন মঞ্চ সারাংশ (Saransh)। এই পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষক ও অভিভাবক একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সহায়তা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সারাংশ অভিভাবকদের তাঁদের সন্তানের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলোর মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে—বাচ্চাদের পছন্দ-অপছন্দ বুঝে নিয়ে তাঁরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, তারই মধ্যে সম্প্রতি সারাংশ-এর সূচনা করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর আওতাধীন স্কুলগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি। এই ডিজিটাল মঞ্চ থেকে অভিভাবকরা প্রতিযোগিতা ও উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যও পেতে পারেন। সব শ্রেণির সব বিষয়ের বইও ই-বুক-এর রূপে এখানে পাওয়া যায়। এই পোর্টালে সব (প্রকল্পের আওতাধীন) স্কুলের বিগত ৩ বছরের তথ্য পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষ সব ছাত্র-ছাত্রীর বিষয়ভিত্তিক বার্ষিক অগ্রগতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে গুণ ও দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবে, যাতে সেই সব দুর্বলতাগুলোর ক্ষেত্রে আরও জোর দিয়ে উন্নতি করা যায়।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

Our Publications...

...Treasure Trove of Knowledge

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Goverment of India

Soochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
Tel : 011-24367260, 24365609

website : publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/publicationsdivision

For more information and business queries,contact : e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

January, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।